কবির প্রেম

ও

অন্যান্য গল্প

আবুল হাসানাৎ

মূল্য ১৸০ টাকা মাত্র

গ্রন্থকারের বাংলা ও ইংরেজী বই ঃ—

১। সচিত্র মাতৃমঙ্গল, জন্ম-বিজ্ঞান ও সুসন্তান লাভ ২৸০

২। সচিত্র যৌনবিজ্ঞান বা কামসংহিতা ... ৪৷৹

৩। সচিত্র জন্ম-নিয়ন্ত্রণ—মত ও পথ ... ১৷৹

৪। কবির প্রেম ও অন্যান্য গল্প ... ১৸০

৫। তরীকৎ বা খোদাপ্রাপ্তি পথ ... ১৲

৬। Crime and Criminal Justice ... ৫৷৹

৭। The Art of Discipline & Leadership. ২।০

বহি বা বিবরণ পুস্তকের জন্য আজই লিখুন।

দি ষ্ট্যাণ্ডার্ড লাইব্রেরী, কে, ঢাকা।

ডি এম, লাইব্রেরী,

৪২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ভূমিকা

বাংলার পাঠক-পাঠিকা বাংলা গল্পের সমাদর করিতেছেন। কতিপয় বন্ধুর অনুরোধে বিভিন্ন মাসিক ও সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত কয়েকটী গল্প তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত করিলাম।

পত্রিকাগুলির সম্পাদকদের নিকট গল্পগুলির জন্য আমি বাধিত।

কলিকাতার সম্ভ্রান্ত প্রকাশক, মেসার্স ডি, এম, লাইব্রেরী পুস্তকটী প্রকাশ ও প্রচার করিবার ভার লইয়া আমাকে কৃতজ্ঞ করিয়াছেন।

ঢাকা
ডিসেম্বর—১৯৪২।

বিনীত—
আবুল হাসানাৎ

সূচীপত্র

———

অচল সিকি*

১

সেদিন নিবারণ কাগজ, কলম, খাতাপত্র লইয়া যখন উঠিয়া পড়িল তখন বেলা পড়িয়া আসিয়াছিল। একলাফে ঘরে ঢুকিয়া কাঠের তাকে জিনিষ পত্র রাখিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইতেই দেখিল স্ত্রী মহামায়া সামনে দাঁড়াইয়া। বলিল,—তাই ত দেখছি, বেলা পড়ে এল! আজ বড্ড দেরী হয়ে গেছে।

মহামায়া বলিল,—হ্যাঁ তা'ত বটে। কিন্তু তোমার মুখ ত দেখছি শুকিয়ে গিয়েছে। আবার মাথা ধরল না'ত?

— না মাথা ধরেনি তবে ঘুলিয়ে গিয়েছে। যাই আবার খেয়ে দেয়ে বার না হলে চল্‌বে না দেখছি।

মহামায়া এই কথায় সন্তুষ্ট হইতে পারিল না, চুপ করিয়া রহিল। নিবারণ স্নান করিতে চলিয়া গেল।

শিশুবৃত্তি হইতে ছাত্রবৃত্তি-এর কোন ধাপে যে নিবারণ ডিগবাজী খাইয়াছিল তাহা তাহার নিজেরই মনে ছিল না। তবে গাঁয়ের লোকেরা তাহাকে পণ্ডিত বলিয়াই জানিত। এক ঘটী কালি, দু'তিনটি বড় বড় খাগের কলম লইয়া ঘণ্টাখানেক কসরৎ করিলে সে একখানা "পুরোগজী" খৎ বা তমসুক লিখিয়া

---

* বিচিত্রা—১৩৪৩।

ফেলিতে পারিত। বড় বড় অক্ষরগুলি দেখিয়া সবাই বলিত—মশায়ের হাতের লেখা একটু বেশিরকম পষ্ট।

পিতার মৃত্যুর পর হইতে নিবারণ যোগ্যতার সহিত ব্যবসায় চালাইয়া আসিতেছিল। সকাল হইতে বারান্দায় দপ্তর খুলিয়া বসিয়া রাস্তার দিকে শিকারের উদ্দেশে তাকাইয়া থাকিত। লোকজন আসিতেছে দেখিলেই খাতা পত্রের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া হিসাবে মন দিত। গাঁয়ের এ ব্যাঙ্কের সে সর্ব্বেসর্ব্বা কর্ত্তা।

ভাত খাইতে খাইতে নিবারণ স্ত্রীর নিকট কৈফিয়ৎ দিল, দত্তপাড়ার তিন তিনটী খাতক তিন তিন বার ওয়াদা করিয়াও ওয়াদা খেলাপ করিয়াছে, আজ তাহাদের আসিবার শেষ তারিখ ছিল। বোধ হয় অন্য কোনও মহাজন তাহাদেরে ভাগাইয়া লইয়া গিয়া থাকিবে। গিয়া একবার তত্ত্ব না নিলেই নয়।

যাইবার সময়ে মহামায়ার হাতে একটী টাকা দিয়া বলিল,—দত্তপাড়ায় যখন যাচ্ছি তখন আরও দু'টো গাঁ হয়ে আসব। সংসারটা কি কঠিন স্থান দেখেছ? দেশশুদ্ধ লোকের পরিচর্য্যে করে বেড়ানোই যেন আমার ব্রতের মতো হয়ে পড়েছে।

মহামায়া অনেক দেখিয়াছে। স্বামীর প্রতি তাহার অগাধ ভক্তি থাকিলেও তাহার এই উপকার-ব্রতে আস্থা মোটেই ছিল না। মহামায়ার অন্তর ছিল উদার কিন্তু এ সংসারে ঢুকিয়া অবধি তাহাকে হইতে হইয়াছিল নির্জীব।

২

দুইদিন পরে বাড়ী ফিরিয়া চুপ করিয়া ঘরে ঢুকিয়া জানালার নিকট বসিয়া নিবারণ আদায় করা টাকা পয়সা গণিতে লাগিল। সিন্ধুক খুলিয়া টাকা পয়সা রাখা বা লওয়া—এ উভয় কাজটি সে সকলের অলক্ষ্যেই করিত। ভাবিত, টাকা পয়সা আছে জানিলেই স্ত্রীলোকের অপব্যয় করিবার স্পৃহা জন্মে।

স্ত্রী রান্নাঘর হইতে ফিরিতেছে দেখিয়া সে টাকার তোড়া এবং চাবির ছড়া গোপন করিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল। মুখটী একটু গম্ভীর করিয়া ডাকিল, মহামায়া,—এই যে বাড়ী ফিরলুম। একটু এদিকে এস, খোকা কোথায় ?

—হ্যাঁ গা তুমি ? দিব্বি চোরের মত ঘরে ঢুকে খোকার জন্য মায়া দেখাচ্ছ ? এলে দশ গাঁ বেড়িয়ে ?

—উঃ মহামায়া,—সে যে কি কষ্ট! যে দুর্দ্দিন পড়েছে—একটী পয়সা আদায় করতেই প্রাণ বেরিয়ে যেতে চায়।

মহামায়া বিশ্বাস করিল, বলিল, হ্যাঁ, তা'হলে তোমাকে একটু সবুরই করতে হবে। লোকজনকে অযথা পীড়াপীড়ি করো না। যাই রান্নাটা সেরে আসি গে।

—বাজারের আর দরকার নেই ত? তা' হলে ঘুরে আসতুম। সেই টাকাটার কত খরচ হয়েছে ? বাকী পয়সাটা দিয়ে তোমার ফরমাসটা বলে ফেল দেখি ?

প্রথম কথার উত্তরে মহামায়া বলিল, না দরকার নেই। মোটে পনরটি পয়সা খরচ হয়েছে—ভাবনা নেই,—বলিয়া বালিশের তলা হইতে বাকী পয়সাগুলি আনিয়া নিবারণের সামনে ফেলিয়া বাকী প্রশ্নের জবাব না দিয়াই রান্নাঘরের দিকে প্রস্থান করিল।

নিবারণ বিরক্ত হইল। পয়সাগুলি গণিতে গণিতে মন্তব্য করিল,—উঃ—এ জাতটাকে বাধ্য রাখা কি দায়!—

একটি পয়সার হিসাব না মেলাতে নিবারণ বাক্স-পত্তর উল্টাইয়া পাল্টাইয়া, সিন্ধুকের তলা ঝাড়িয়া, ছোট ছোট গর্ত্ত ঘাঁটিয়া ক্লান্ত হইয়া বসিয়া পড়িয়াছে, এমন সময়ে রান্নাঘর হইতে মহামায়া ডাকিল,—ওগো মহাজন! শুন্‌ছ,—একটি পয়সা কিন্তু ভিক্ষুককে দিয়েছি—বল্‌তে ভুলে গেছলুম।

নিবারণের বিরক্তির অবধি রহিল না। কিন্তু, একটি পয়সা লইয়া ঝগড়া করা ভাল দেখাইবে না ভাবিয়া উত্তর করিল,—বেশ করেছ, গিন্নী,—এক-আধটু দান না করলে কি ঘরে লক্ষ্মী থাকে? হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল, একেবারে কিছু না বলিলে আবার মহামায়ার চাল খারাপ হইতে পারে। তাই আবার উপদেশ দিল,—কিন্তু দেখ, ওরা যখন পয়সা দিয়ে চা'লই কিনে খাবে তখন ওদেরে একমুঠো চা'ল দিলেই ত ভাল হয়। কথাটা বুঝলে ত মহামায়া? তা' বলে অন্যায় কিছু করো নি কিন্তু—অন্যায় কিছু করো নি।

৩

মহামায়া বুঝিল ; কিছু বলিল না।

নিবারণ এবার পয়সাগুলি পরখ্ করিতে যাইয়াই কাঁপিয়া উঠিল। উঃ—এ যে অচল সিকি !

মহামায়ার উপরে এবার সত্য সত্যই তাহার রাগ হইল। মেয়েরা যদি ব্যবসাইত হইত, পুরুষেরা তাহা হইলে শুধু তাহাদিগকে ঠকাইয়াই কাজ হাসিল করিয়া লইতে পারিত !

সে বিমর্ষ বদনে উঠিয়া রান্নাঘরের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। এই মাত্র একটি পয়সার জন্য স্ত্রীকে উপদেশ দিয়াছিল। এখন আবার সিকি লইয়া উপদেশ দেওয়াটা কম কথা নয়।

সে ভাণ করিয়া মিষ্টি গলায় ডাকিল,—মহামায়া ! মহামায়া !

স্ত্রী উত্তর করিল,—কি, কী হয়েছে ? বলেই ফেল না।

—না, না—বল্‌ছি কি—ছাখ—রান্নাটা কতদূর হল ? খিদে পেয়েছে !

—এই হ'ল বলে। তুমিই না বল্‌ছিলে আমায় বাজার ক'রে এনে দেবে ?

সহসা সুযোগ মিলিয়া গেল। নিবারণ বলিল,—হ্যাঁ পারতুম বৈ কি ? কিন্তু—কাল বাজারটা কা'কে দিয়ে করিয়েছিলে বল ত ?

—কেন ? ও বাড়ীর ছেলেটাকে দিয়ে—

—হ্যাঁ, তবেই বুঝেছি,—পাজী, নচ্ছার, বদমায়েস কোথাকার। সে যে তোমায় ঠকিয়েছে ?

—ঠকিয়েছে ? বল কি ? কেমন ক'রে ?

—হ্যাঁ, লক্ষ্মীটী—একবার দেখই না ?—এই অচল সিকি-খানা তোমার ঘাড়ে চাপিয়েছে ! পাজী, গাধা—হারামজাদা কোথাকার !—

—আচ্ছা, কি করছ বল দেখি !—পুরাণ সিকিটে ত আর সে নিজে বানায়নি। বাজারে হয়ত কেউ ওকে ঠকিয়েছে। উপকার করে অবশেষে সে খাচ্ছে গাল ! দাও আমায়, আমি নিজের গাঁট থেকে ক্ষতিপূরণ করে দিচ্ছি।

ক্ষতিপূরণের কথা শুনিয়া নিবারণ হাসিয়া ফেলিল—বলিল, আচ্ছা, তা না হয় হবে। কিন্তু সিকিটি ত আর তোমার কোন কাজে আসবে না। ওটাকে আমিই রেখে দিচ্ছি। ও বাড়ীর ছেলেটাকে দেখিয়ে একটু জিজ্ঞেস ত করতে হবে ?

এবার মহামায়া ব্যথিত হইয়া বলিয়া উঠিল,—আর যাই করনা কেন, ছেলেটাকে তুমি কিচ্ছু বলতে পারবে না ! —আমার মাথার দিব্বি রইল—

নিবারণ হাত বাড়াইয়া সিকিটা ফিরাইয়া দিতে যাইতেছিল হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল, মহামায়ার দ্বারা ক্ষতিপূরণে তাহাদের সত্যিকারের কোন ক্ষতিপূরণ হইবে না। হাত ফিরাইয়া লইয়া

বলিল,—আচ্ছা আমার কাছেই এটা এখন থাক্। পরে যা হয় করা যাবে।

পরদিন সকাল বেলা মহামায়া ও-বাড়ীর ছেলেটাকে পাকড়াও করিল। বলিল,—দ্যাখ্, তুই অচল সিকিটি আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছিস্ কেন রে! ঠকাবার আর বুঝি জায়গা পেলি না?

সতীশ ভড়কাইয়া গেল,—কবে মা? আমি ত কিছুই জানিনে। সিকিটা অচল? কৈ দাও না দেখি, আমি চালিয়ে দিতে পারি কিনা?

মহামায়া বুঝিল নিবারণ ওকে কোন কথা বলে নাই। বলিল,—আর জানতে হবে না বাবা। মনে কিছু করিস নে, আমি মিছিমিছি তোকে রাগাচ্ছিলুম।

৪

তিন দিন পরের কথা। সন্ধ্যায় খাইতে বসিয়া নিবারণ হো হো করিয়া হাসিতে লাগিল। সবিস্ময়ে মহামায়া জিজ্ঞাসা করিল,—হঠাৎ এত খুসীর কারণ কি হল?

—ওঃ—সে ভারি মজা—এ'কেই বলে তা—মা—সা! আজকের ভরা হাটে কি গণ্ডগোলই না লাগিয়ে দিলুম!—

মহামায়া গম্ভীর হইয়া গেল।

—আরে, ঐ যে সিকিটা নিয়ে গেলুম তোমার কাছ থেকে, ওটাকে একটুখানি চিন দিয়ে চালিয়ে দিলুম চাল্‌ওয়ালা আবেদ

মিয়ার কাছে। কৈ ধরতে ত পারে নি?—না না, ছিঃ! মহামায়া, চালাবার মতলব আমার মোটেই ছিল না। ছিল শুধু একটু তামাসা দেখবার।—আরে আর যায় কোথা? ঘণ্টা দুই পরে দেখি মেছোবাজারে হল্লা! সে বিষম হল্লা! জলধর কৈবর্ত্ত আর রসিক বৈরাগী দু'জনে একেবারে বকাবকি ছেড়ে কিলাকিলি আরম্ভ করেছে। রসিক বলে, উল্লুক জেলে —ওটিকে কি আমি নিজে বানিয়েছি—তোর বাবারা যে আমাকে দিয়েছে। আমি সিকিটি একবার চেয়ে নিয়ে দেখি আমাদেরই তিনি!—নিবারণ হাসিতে লাগিল।

মহামায়া বিদ্রূপাত্মক সুরে বলিল—তা আর হাসবেনা? কিন্তু মার খেল যারা? রাখ তোমার তামাসা। আমি আর শুন্‌তে চাইনে।

সেদিন রাত্রে মহামায়া সিকিটার সম্বন্ধে একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিল। নিদ্রাভঙ্গে সে ক্ষণকাল নিঃশব্দে শুইয়া রহিল, তারপর যুক্তকর কপালে ঠেকাইয়া বলিল, এবার পেলে আর তোমাকে হারাচ্ছিনে! একেবারে অচল করব।

পরদিন সকালে সে স্বামীর নিকট সকাতরে নিবেদন করিল, ওগো তোমার পায়ে পড়্‌ছি। সিকিটি আমায় ফিরিয়ে এনে দাও! যেমন করে পার। বুঝলে?

নিবারণ হাসিয়া বলিল, না,—তা এখন আর সম্ভব নয়। ওটা এখন বড় শক্ত পাল্লায় গিয়ে উঠেছে। শোন নি ত—

তারপর কি হ'ল—হল্লা শুনেই তেড়ে এল জগন্নাথ সিংজী—থানার সিপাই, বাজারে কিজন্যে এসেছিল। দু'পক্ষকেই বিস্তর কিল ঘুসো বিতরণ করে বল্‌ল,—শালা লোক—রাজার টাকা জাল কর্‌ছে? চল, সবকো হাম থানামে লে যায়েঙ্গে—চল্‌।

—এবার নিমিষের মধ্যে সব হল্লা থেমে গেল। কার কাছ থেকে কে পেয়েছে হিসেব দিতে দিতে আর হাতজোড় করতে করতে আধ ঘণ্টা কেটে গেল। সিকিটি সিংজি বার বার পরখ্‌ করে মাথার পাগড়ীর মধ্যে লুকিয়ে ফেল্ল। কি বল্‌ব, মহামায়া, আমার গা যে তখন কি রকম কাঁপছিল! মোটের উপর সবাইকে কিছু কিছু সেলামী দিতে হ'ল; তবে মোকদ্দমা মিট্‌ল। কি কাণ্ডটাই না হয়ে গেল! যাক্‌ সিকিটিও রক্ষা পেল, আমরাও রেহাই পেলাম!

মহামায়া কাতর মুখে বলিল,—না গো না, ওর জন্য হয় ত আরও কত কি কষ্ট পেতে হবে—সব যে আমার কপালের দোষ—না হলে কি আর ওটাকে হাতছাড়া হ'তে দিতাম!

নিবারণ বলিল, রাজার সিকি রাজার লোকের কাছে গিয়ে উঠেছে—ওর জন্যে আর মিছি মিছি ভেব না।

স্বামীর কথা শুনিয়া মহামায়ার ভাবনা দশগুণ বাড়িয়া গেল।

মহামায়ার ভয় লাগিয়াই রহিল, পাছে সিকিটা তাহার কাছে না আসিয়া আবার চলিতে আরম্ভ করে। নিবারণ

কিন্তু মহামায়ার বিষণ্ণ বদন দেখিলে তাহাকে হাসাইতে চেষ্টা করিত—মহামায়া, ঐ যে অচল সিকিটে! মনে আছে ত? কি তামাসাই না ওটা করল! হো হো হো!

কিন্তু ফলের চেয়ে কুফলই বেশী হইত। মহামায়ার শঙ্কিত প্রাণকে আরও ভাবাইয়া তুলিত।

৫

ইহার পর কয়েক দিন চলিয়া গেল। ব্যাপারটী উভয়ই প্রায় ভুলিবার উপক্রম করিয়াছিল এমন সময়ে একদিন হঠাৎ হাট হইতে ফিরিয়া মাথার বোঝাটি নামাইয়া নিবারণ মহামায়াকে বাহিরের আঙ্গিনায় পাকড়াও করিল। বলিল,—শেষ হয়নি, মহামায়া, শেষ হয়নি। আমি ভুল বুঝেছিলুম—সেই সিকিটি আবার! ভয় ক'রো না—আবার ওটা বেশ চলতে আরম্ভ করেছে। কে বলে ওটা অচল!

মহামায়া আগ্রহান্বিত হইয়া বলিল.—ও সব বাজে কথা রাখ, পেয়েছ ত শীঘ্‌ঘীর আমাকে দাও!—আমার মাথার দিব্বি রইল—আর এক তিলও দেরী ক'রো না।

—আরে পাইনি, তবে সন্ধান পেয়েছি।—আগে ব্যাপারটা শোনই না! ওই যে দেবু ছোক্‌রাটা,—ফিরি করে মিঠাই বেচে—হাটে দেখা পেয়ে বলে কি,—নিবারণ কাকা, একটু নিরালায় চল, কথা আছে।—

আমি বললুম, চল্, কিন্তু মিছিমিছি কাঁদছিস্ কেনরে? হাটের এক কোণে গিয়ে চুপি চুপি আঁচল থেকে একটা সিকি বের করে বললে, জগন্নাথ সিপাই তার বাটা থেকে সের খানেক মিঠাই খেয়েছিল। পয়সা চাইতে এই সিকিটি দেয়। সিকিটি অচল দেখে দেবু ফেরৎ দিতে গেলে সিংজী ধমক দিয়ে বলে,—রাজার মাথা আঁকা রয়েছে দেখছিস্‌নে—অচল বললে জেলে দেবো। দেবু ছোড়াটাত কেঁদে কেঁদেই আকুল।—বলে, এখন কি করি বলত কাকা? আজকের বাজারে আমার যে সর্ব্বনাশ হয়ে গেল! আমি পরামর্শ দিলুম—যা হয়েছে তার ত আর উপায় নেই। এখন ওটাকে শীঘ্‌গীর কোথাও ফেলে দে—নইলে আবার কোন নতুন ফ্যাসাদে পড়ে যাবি। হয়ত বনেবাদড়েই ফেলে দিয়ে থাক্‌বে।

মহামায়া চিৎকার করিয়া উঠিল—তোমার উপরে না দিব্বি রয়েছে পেলেই আমাকে এনে দেবে, আর তুমি ফেলে দিতে বললে, যাও আমাকে আর জ্বালিও না। উঃ ভগবান! সারাজীবন চোখের জল দিয়ে শেষে আমাকে ওর প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে দেখছি! যাই দেবুকে খবর দিই গে, সে কি করতে পারে দেখি!

নিবারণ বাধা দিয়া বলিল, ছিঃ এমন কাজ করতে আছে? এক্ষুণি পুলিশ খবর পেলে বাড়ী চড়াও করে বস্‌বে। আমি দেখব কোথায় ফেলেছে, তার খবর ওর কাছ থেকে নিতে পারি কি না।

৬

পরদিন সকালে নিবারণ বারান্দায় বসিয়া হিসাব লইয়া নাড়া চাড়া করিতেছিল। মহামায়া উপস্থিত হইয়া বলিল, তুমি না বললে দেবুর কাছ থেকে সন্ধান নিয়ে আসবে। কৈ গেলে না ত? অপ্রতিভ হইয়া নিবারণ বলিল, এই এক্ষুণি বের হব হব মনে করছিলুম এমন সময়ে তুমি এসে পড়লে। ভেবনা মহামায়া, একটু পরেই যাচ্ছি।

"বাবা, অন্ধকে দয়া কর" বলিয়া অন্ধ রহিম ছেলের মাথায় হাত দিয়া আসিয়া আঙ্গিনায় দাঁড়াইল।

নিবারণ বিরক্তিমিশ্রিত সুরে বলিল—আঃ কি চাই? শীঘ্রগীর বলে ফেল রহিম।

—বাবা আর কিছু চাইনে, শুধু একটু সময় চাই—একটা কথা বলবার আছে। বাবা ছাদেক—আমায় আস্তে আস্তে বারান্দার কোণে একটু বসিয়ে দে ত।—খোদা, সকলই তোমার ইচ্ছে।

নিবারণ মহামায়াকে ডাকিয়া বলিল—তুমিই রহিমের কথাটা শোন মহামায়া,—আমি যাই দেবুর সন্ধানে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই রহিমের কান্নাকাটি আরম্ভ হইল,—বাবা, সকলই খোদার মর্জ্জি!

মহামায়া বাধা দিয়া বলিল—উনি যে এক্ষুণি বেরিয়ে গেলেন রহিম—তুমি আমাকে বল, আমিই শুনছি।

—বলব বৈ কি মা! বাবা ছাদেক, দে'ত ঐ সিকিটে। কাল হাটে মা, আমার সর্ব্বনাশ হয়ে গেল। কষ্টের কথা বল্‌ছি না মা—লাঞ্ছনা—উঃ কি লাঞ্ছনাটাই না আমার সইতে হ'ল। কাল হাটের ভিড়—এক কোণে দাঁড়িয়ে ভিক্ষে কর্‌ছি—সারা দিনটায় শুধু দু'টো পয়সা পেয়েছি—কপালে যা তাই নয়? বাড়ী ফিরবার মুখে হঠাৎ কে একজন এসে এই সিকিটে হাতে গুঁজে দিয়ে চলে গেল।

—আমি কিন্তু বুঝেছিলুম, মা এটা পোয়া পয়সা। সিকি? কে আমায় এত দেবে? হঠাৎ বাবা ছাদেক চেঁচিয়ে উঠল, বাবা, সিকি পেয়েছি! সিকি পেয়েছি!!

—বুঝলে মা, মনের অবস্থা তখন আমার কি! বললুম, খোদা, শুকর তোমার! হঠাৎ মনে পড়ে গেল মা—বাবা ছাদেক একদিন সন্দেশ খেতে চেয়েছিল, কিন্তু দিতে পারি নি। কি করে দেব বল? চারটের বেশী পয়সা ত আর মেলে না কোন দিন—আঃ বাছার আমার সে সাধ পূরণ করতে পারি নি এতদিন! বললুম চল্‌ত আমায় নিয়ে ময়রার দোকানে।

—রসিক শীলের দোকান থেকে দু' আনার সন্দেশ ওকে খাইয়ে কেবল সিকিটে তাদের দিয়েছি—অম্‌নি তেড়ে এল মা দোকানের সবাই। উঃ যে অন্ধকে, মা, বাঘে খায় না, সাপে কাটে না তাকে মা মানুষ এমনি করে ঠকিয়ে গেল! গাল ত সবাই দিলে, মারতেও কেউ কসুর করত না যদি বাবা ছাদেক

আমার অমন চেঁচিয়ে না উঠত। কেঁদে বললুম—ওগো, তোমাদের পায়ে পড়ি, আমায় রেহাই দাও, সিকিটে পরখ করে দেখবার শক্তি আমায় খোদা দেয়নি—আমায় খোদা দেয়নি—

রহিমের কান্নার উচ্ছ্বাস হয়ত সারা জগৎকে কাঁদাইয়া দিতে পারিত, কিন্তু যে নারীর সম্মুখে সে আত্মনিবেদন করিতেছিল, তাহার হৃদয়ে যে উহা কত নিষ্ঠুরভাবে প্রতিঘাত করিল তাহা শুধু দয়াময়ই দেখিলেন।

রহিম বলিতে লাগিল, না মা, দু'আনা পয়সা বৈত নয়? তা দশ গাঁ বেড়িয়ে এক দিনেই হয়ত যোগাড় করে ফেলব। করতেই হবে; না হলে ত আমার লাঠি আর গামছাটা ওরা ফেরৎ দেবে না। এতটুকুও বিশ্বাস করলে না মা ওরা আমায়। হ্যাঁ মা, বলত অন্ধ আর কতদূর পালিয়ে যেতে পারে?

আবার মহামায়ার শ্বাষরোধ হইবার উপক্রম হইল। একি নিদারুণ পরিহাস! মনে পড়িয়া গেল, তাহার স্বামী সিকিটায় চিহ্ন দিয়া গিয়াছিল। বলিল,—ভাই ছাদেক, নিয়ে আয় ত রে সিকিটে—দেখি।

সেই সিকিটিই বটে!

সিকি দেখিয়া মহামায়ার মুখে হাসির আভা দেখা দিল। বলিল—বাবা রহিম, সিকিটি আমার বড্ড পছন্দ হয়েছে; ওটিকে আমায় দিয়ে দাওনা—আমি পয়সা দিচ্ছি!

—অচল সিকি! ওর জন্যে আবার পয়সা?—অম্নি নিয়ে নাওনা মা, ওটাকে—আমার আর ওটা দিয়ে কি হবে?

মহামায়া ততক্ষণ উঠিয়া পড়িয়াছে। এক মুঠো পয়সা আনিয়া ছেলেটার হাতে গুঁজিয়া দিয়া বলিল,—ক'টা পয়সা দিলুম—সিকিটের কথা আর কারুর কাছে ব'লোনা বাবা—

"বাবা, বাবা, দেখ কতগুলো পয়সা!" বলিয়া ছাদেক রহিমের হাতে সব পয়সাগুলি ঢালিয়া দিল।

রহিম উত্তেজিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল, একি মা? ওর জন্যে এত? কেন? বেঁচে থাক মা আমার! সংসার তোমার—

বাধা দিয়া মহামায়া বলিল,—আমার আর কি হবে বাবা? —আশীর্ব্বাদ কর, আমার খোকার মঙ্গল হোক্।

তাই হোক্ মা, তাই হোক্। খোদা খোকার মঙ্গল করুক!

৭

বাড়ী ফিরিয়া নিবারণ কৈফিয়ৎ দিল, দেবু সিকির কথা কিছুতেই বলিল না। জিজ্ঞাসা করিল, রহিম চেয়ে চিন্তে কিছু নিয়ে টিয়ে যায়নি ত!

মহামায়া উত্তর করিল,—না—সে কোনো জিনিষ নিতে আসেনি। শুনিয়া নিবারণ আশ্বস্ত হইল। ইহার বেশী তাহার কিছু জানিবার দরকার ছিল না।

কয় দিন পরে নিবারণ খোকাকে কোলে লইয়া আদর করিতেছিল। হঠাৎ তাহার গলায় রূপার একটি পদক দেখিয়া বিস্মিত হইল।

পরখ করিয়া দেখিয়াই মহামায়াকে পাকড়াও করিল—বলিল,—শেষে দেবু তোমায় দিয়ে গেছে না? বদমাস্‌টা আমায় ত সিকিটির কথা কিছুতেই বললে না। রোসো পুলিশ দিয়ে বেটাকে না ধরিয়ে দিই ত আমার নাম—

মহামায়া রাগ করিল,—তোমায় আমি কিছু বলতে পারি না—কিন্তু মাফ ক'রো—ভগবান ওটা আমায় ফিরিয়ে দিয়েছেন—তোমার আর পুলিশ আনতে হবে না।

—তা যেন হ'ল, কিন্তু বলত শেষে অচল সিকি খোকার গলায় ঝুলিয়ে দিলে কেন? আমি কি সোনার পদক বানিয়ে দিতে পারতুম না?

শুষ্কমুখে মহামায়া বলিল, তা পারবে না কেন? ইচ্ছে হলেই গড়িয়ে দিয়ো। তারপর যুক্তকর মাথায় ঠেকাইয়া মনে মনে বলিল, জানে না তাই সোনার পদকের কথা বল্‌ছে; এ অচল সিকি খোকার গলায়ই অচল হয়ে রইল!

—:—

হোমিওপ্যাথী *

১

টী এসোসিয়েশনের এজেন্সি না লইয়াও নবীন যে উদারতার সহিত চা পান ও তাহার গুণগান করিত তাহার তুলনা মেলা ভার। বেড়াইতে বাহির হইবার পূর্ব্বে বারান্দায় পায়চারী করিতে করিতে চায়ের জন্য তাড়াহুড়া করা, চায়ের কাপ আসিলে আরাম কেদারায় বসিয়া পড়িয়া বহুক্ষণ পর্য্যন্ত নিরীক্ষণ, পর্য্যবেক্ষণ ইত্যাদি করা এবং রাস্তা দিয়া কোন জানাশুনা লোক যাইতেছে দেখিলেই তাহাকে অযথা ডাকাডাকি করা—এসব ছিল তাহার প্রাত্যহিক কাজ।

নবীন চেঁচামেচি করিতেছে, হঠাৎ অনাথকে ফটকের কড়া লইয়া নাড়াচাড়া করিতে দেখিয়া—এ্যা, অনাথ, তুমি ভাই হঠাৎ কোথা থেকে? এস, কুই হ্যায়? আরে এরা সব পালাল কোথা? বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে শেষে নিজেই গিয়া বন্ধুকে আগাইয়া লইয়া আসিল।

—বহুদিন পরে দেখা ত' বটে। তারপর? খবর সব ভাল? তাই ভাবছিলুম—চায়ের সময়টায় কেউ না কেউ এসেই পড়ে—বন্ধুবান্ধবের কথাই বলছি—আমার বড্ড আমোদ লাগে কিন্তু।

---

* দীপালী—১৯৪২।

অনাথ বসিতে বসিতে বলিল—হ্যাঁ ভালই। তবে ক'দিন বড্ড অশান্তিতে কেটেছে, একঘেয়ে জীবন আর কাটতে চাইছে না। পশ্চিম থেকে একটু বেড়িয়ে আসব মনে করেছি। লম্বা ছুটি নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম। মনে করলুম তোমায় একটিবার দেখে যাই—বহুদিন ছাড়াছাড়ি—নয়?

—অথচ আমায় একটিবার চিঠি লিখেও জানালে না? তারপর জিনিষ পত্তর? আমার এখানেই উঠছ ত'?

অনাথ মাফ চাইল, বলিল—না ভাই, উঠবার আর সময় নেই, রাত্রেই আবার গাড়ী ছাড়ছে।

ব্যস্তবাগীশ নবীন কথা কাড়িয়া লইয়া বলিল—ঐ যে গান্ধীজি বলেছেন, "অহিংসা পরম ধর্ম্ম"। আমার কিন্তু ভাই আর তেমন সুযোগ হল না, আর হবেও না। ঐ যে হেড্ আফিস থেকে আমায় গরজেলা করে দিল তারপর থেকে এখানেই। পাট কিন্‌ছি, হিসাব রাখছি আর চালান দিচ্ছি। ছুটী মেলা ভার। বেশ আছি—তবে একা এই যা। আমার, ভাই, ওই যে উনি মরলেন—মরলেন বলতে পারিনে—হঠাৎ শোক সাগরে ভাসিয়ে রেখে চলে গেলেন—

'বাবু চা'—বলিয়া ভিতর হইতে নবীন বাবুর বামুন ওরফে খানসামা ওরফে বাবুরচি এক পেয়ালা চা ফুঁ দিয়া ঠাণ্ডা করিতে করিতে আনিয়া সামনে রাখিয়া দিল। নবীনবাবু চটিয়া গেলেন,—বেটা পাজী, কতবার বলেছি অমন করে খালি

শরীরে সাম্‌নে আসিসনে। দিনরাত এখানে ভদ্রলোকেরা বেড়াতে আসছেন—তা মোটে গ্রাহ্যই করবে না—বেহায়া বেইমান। যা এক্ষুনি চলে যা।

—আজ্ঞে বাবু—বলিয়া মুখ ভেংচাইয়া বামুন বেচারা চলিয়া যাইতেছিল, আবার ডাক পড়িল—না যাস্‌নে শোন্, চট্ করে আর এক কাপ খুব গরম চা নিয়ে আয়। দেখিস্ ভুলিসনে, দুধ চিনি ভিন্ন করে আনবি, ওই প্রতিদিন যেমন আমায় দিস্—বুঝলি?

বামুন বুঝিল।

—উড়ে বামুন। পাকায় বড্ড ভাল। আজ চায়ের জন্য বড্ড চেঁচামেচি করছিলুম কিনা তাই তাড়াহুড়ায় সব ভুলে গেছে। বড্ড ভক্ত। সমস্ত সংসার ও-ই গুছিয়ে চালাচ্ছে।

—উড়ে বামুন! হো হো হো। এরা আবার ভক্ত নয়? আমার কিন্তু মনে হয় এতে বরং ওরা একটু বাড়াবাড়িই করে। নয়? বলিয়া হাসিমুখে অনাথ নবীনের সমর্থন চাইল।

নবীন প্রসঙ্গ ঘুরাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, হ্যাঁ ভাই, তোমার ছেলেমেয়ে ক'টী হ'ল? উনি ভালো? নিয়ে যাচ্ছো না যে সাথে ওঁকে?

কটী আবার? একটীই ভাবিয়ে তুলে আমায় প্রায় শেষ করছিল। অল্পে বেঁচে গেছি। সে বাঁচাও কি এমনি বাঁচা? হোঃ হোঃ। না ভাই ওঁকে সাথে নেওয়া চলে না। ওঁর

শরীর কেবল সেরে উঠছে—ক'দিন হ'ল, ছেলে হয়েছে কিনা? বাপের বাড়ী আছেন। তাড়া করে উনিই আমাকে পাঠিয়ে দিলেন, ঘুরে আসতে।

—বেশ ত' ওই যে বলেছি—'অহিংসা পরম ধর্ম্ম'। একেই বলে লক্ষ্মীটি, নয়? উঃ সে কতদিনের · কথা!

নবীনের পূর্ব্বস্মৃতি জাগিয়া উঠিল।

অনাথ সহানুভূতি দেখাইতে গিয়া কথা ঘুরাইয়া ফেলিল, বেশ জায়গাটীতে আছ কিন্তু ভাই! টাউনটী বেশ ফুটফুটে, নয়?

নবীন মুখ ভেংচাইয়া ডাকিল—ভজহরি আর কতক্ষণ লাগবে তোর? এলি শীগগীর ক'রে?

এবার অনাথ এত জোরে হাসিয়া উঠিল যে নবীন চমকাইয়া গেল, বলিল—হঠাৎ এত খুসী যে? কারণ?

অনাথের থামিতে থামিতে প্রায় মিনিট তিনেক কাটিয়া গেল। সে রুমাল দিয়া মুখ মুছিয়া কাসিয়া এদিক ওদিক চাহিয়া শান্ত এবং গম্ভীর হইতে চাহিল কিন্তু কিছুতেই পারিয়া উঠিল না। হাসিমুখেই বলিল—আর ভাই, তোমার এখানে ত' দেখছি বেশ মজা! তা বন্ধুদের কাজকর্ম্ম প্রায় সমান্তরালেই চলে। নয়? এসেই দেখি উড়ে বামুন। আবার তাই নয়, একেবারে ভজহরি! কতদিন ধরে আছে ও এখানে? মনে হয় যেন আমার বামুনটাই একেবারে এখানে চলে এসেছে—আশ্চর্য্য বটে। কি কীর্ত্তিই না কর্‌ল ও আমাদের ওখানে—

২

নবীন চালাক। বুঝিয়া ফেলিল, অনাথের বামুনটী না জানি কি অপকর্ম্মই করিয়া বসিয়াছিল। ভাবিল গল্পটী না শুনিলে নয়।

অনেক সাধ্যসাধনা করা সত্ত্বেও যখন অনাথ কাহিনীটী বিবৃত করিতে রাজী হইল না তখন নবীন রাগ করিল,—বুঝেছি ওটা তোমার কোন কেলেঙ্কারীর কথা। তবে বন্ধুকে বলবার মতও যদি না হয় ত' আর বলো না।—কেলেঙ্কারী সকলের জীবনেই দু'চারটী হয়ে থাকে। আমিই কি শেষে কম কীর্ত্তি করেছিলুম? আমার স্ত্রীকে শেষকালে কি দুঃখ নিয়েই না মরতে হল! উঃ ভাবলে চোখে জল আসে—নবীন শোক সম্বরণ করিল,—ওঃ অহিংসা পরম ধর্ম্ম!

কিন্তু ফল কিছুই হইল না। অনাথ অন্য কথা দিয়া প্রসঙ্গ চাপিয়া যাইতেছিল।

উড়ে বামুন আসিয়া পড়িল। এবার সে ভিজা একখানা ময়লা গামছা সাপের মত গলায় জড়াইয়া নবীনের হুকুমের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছিল। নবীন কৈফিয়ত দিল—আমার তাড়াহুড়োয় ওর কাপড় নেবার সময় হয়নি। লও এক কাপ চা—না রাখ আমিই বানিয়ে দিচ্ছি।

চায়ের প্রসঙ্গ আসিলে নবীনের উৎসাহের আর অবধি থাকে না। অল্প পয়সার এই যে পরম উপভোগ্য পানীয়,

এর যদি প্রচলন না হইত তাহা হইলে এদেশের লোকেরা মদ অর্থাৎ বিষ পান করিয়া প্রাণ দিত। ইত্যাদি, ইত্যাদি।

চায়ের রং খুব হালকা। নবীন এবার কৈফিয়ত দিল—এ কিন্তু ভাই আমার রুচি। চায়ের যদি সত্যিকার নিজস্ব কোন গুণ থাকে তা' হলে ওর পরিমাণ যত কম হবে ওর শক্তি ততই বৃদ্ধি পাবে। বুঝলে কিনা ভাই, আমি মনে করি হোমিওপ্যাথী জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ না করলে বোধ হয় মানুষ ঔষধ অর্থাৎ বিষের মাত্রা বাড়িয়ে বাড়িয়ে একেবারে গোল্লায় যেত। নবীন হাত জোড় করিয়া হানিম্যানের উদ্দেশ্যে যে ভক্তিপূর্ণ অভিবাদন করিল তাহার ভঙ্গীতে অনাথ হাসির তুফান উঠাইয়া দিল।

মিনিট পাঁচেক পরে থামিয়া অনাথ বলিল—ঠিক বলেছ ভাই, আমার ওতে বিশ্বাস মোটেই ছিল না, তবে হালে হয়েছে। উঃ আমায় যে কি সঙ্কট থেকে ওটি উদ্ধার করলে তা বলে শেষ করা যায় না!

নবীন আবার রাগ করিল—তোমার বিপদ, সঙ্কট বা কেলেঙ্কারী—যা কিছুই হয়ে থাক্ না কেন, সে যখন বন্ধুরই শোনবার অযোগ্য তখন আর ওকথা বলে শুধু শুধু ঘাঁটিও না। —ওঃ অহিংসা পরম ধর্ম্ম!

৩

অনাথ হঠাৎ গম্ভীর হইয়া বলিল—রাগ করো না ভাই

বলছি। বড় সুখের গল্প নয় কিন্তু। দেখছ আমার চেহারা? বড্ড মুষড়ে পড়েছিলুম,—উঃ সে কি বিপদ!

সেদিন বৃহস্পতিবার। আফিস থেকে পাঁচটার পর বাড়ী ফিরছি। বড্ড চায়ের তেষ্টা পাচ্ছিল।

নবীন চিৎকার করিয়া উঠিল,—ঐ'যে চা! চা বটে ত'? কেরানী জীবনের যে ওটী সম্বল। অনাথ গম্ভীরভাবে বলিয়া চলিল,—

—হঠাৎ গেটের দরজায় ঘা খেয়ে চৈতন্য হল। দেখি ফটকে তালা লাগান। ডাকলুম, কুই হ্যায়? কে আছিস? সাড়া নেই। বাসায় থাকবার মধ্যে ছিল স্ত্রী আর চাকরবাকরের মধ্যে উড়ে বামুন, ভজহরি।

হাসিবার পালা পড়িল এবার নবীনের উপর।—হো হো হো! উড়ে বামুন। একেবারে ভজহরি? দু'জনেই এক সঙ্গে বাড়ী হতে উধাও? ব্যাপার ত' দেখছি ভাল নয়! তবে ঐ'যে! অহিংসা পরম ধর্ম্ম!

অনাথ তেমনই ভারী মুখে বলিয়া চলিল—উড়েটি তার স্ত্রী নিয়ে পাড়ায় থাকত। আমার এখানে সময়ে থাকত, অসময়ে থাকত না। কিন্তু আমার আশার কি হল? কড়া নাড়তে নাড়তে কুই হ্যায়, কে আছে, চেঁচাতে লাগলুম।

একটি ভদ্রলোক রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন,—বললেন, মশায় আপনি ত বেশ লোক বটেন। বাহির থেকে তালা লাগানো

রয়েছে আর আপনি দিব্যি 'কে আছ', করছেন। ধমক দিয়ে বললুম—নিজের পথ দেখুন ত' মশায়।

কিছুক্ষণ পরেই দেখি ঘোড়াগাড়ী হাঁকিয়ে স্ত্রী আমার চোখ রাঙ্গাতে রাঙ্গাতে আসছেন। চাবিছড়া ঝনাৎ করে পায়ের সামনে ফেলে দিয়ে বললেন—ও-বাড়ীর ছোঁড়াটাকে দিয়ে গাড়ী আনিয়ে এই খুঁজে এলুম তোমায় আফিসে। তুমি আর তোমার বামুন থাক, আমি সরে পড়ছি।

ব্যাপার দেখলুম গুরুতর। ভাবলুম তুমুল একটা কিছু কাণ্ড হয়ে গেছে, নইলে আফিস পর্য্যন্ত চড়াও করার দরকার হত না। বললুম—আচ্ছা এক্ষুণি শুনছি কি হয়েছে। এত অধীর হয়েছ কেন? বেটা পাজী পালাল কৈ—বলিয়া সামনের দিকে কাল্পনিক মুষ্ট্যাঘাত করেছি অমনিই দেখি গাড়ীর পিছন থেকে এক লাফে নেমে এসে—"বাবু এই যে আমি" বলে ভজহরি হাজির। রাগ একটু পড়ে গেল কিন্তু তা হলেও ওর মাথার টিকিটি ধরে বললুম, ঘরে চল,—তোকে দেখে নেব রে হারামজাদা।

ঘরে ঢুকে বিচারকের আসনে বসলুম।

নবীন বলিল,— রাখ একটু হুকাটা চেয়ে নিচ্ছি। ভজহরি! ভজহরি!! শিগ্‌গীর করে নন্দের হুকোটি দিয়ে যা ত'। আচ্ছা তারপর?

—বাদিনীর পক্ষে জবানবন্দী—উড়ে বামুন তাকে মোটেই গ্রাহ্য করছে না। বলে, আমি বাবুজীর পুরান চাকর আছি।

গৃহিণী হুকুম করেন সে উল্টো চলে। খালি বলে, আমি বাবুজীর ঘরে চুরি হতে দেব না।

উড়ে কাঁদ-কাঁদ ভাষায় জবাব দিল,—সে মাইজীর কথা সব শুন্‌তে আছে। তবে তিনি যে বার বার তাকে স্নান কর আর হাত ধোও বলে হয়রাণ করছেন, তা কেন? সে কি ছোট জাত?

ধমক দিয়ে বললুম—যা পাজী আমার বাড়ী থেকে। গৃহিণীকে বললুম,—এর জন্য এত হৈ চৈ করা কি ভাল হয়েছে? সে ত' আমাদের দাস, এক কথাতেই ত' তাড়াতে পার।

নবীন বলিয়া উঠিল—তা বৈকি? কিন্তু এরা যে বড্ড ভক্ত। রাখ, কলকেটা একটু দেখে নি—হ্যাঁ তারপর? 'ওঃ অহিংসা পরম ধর্ম্ম!

আশা আমার তখন অন্তঃস্বত্ত্বা—মেজাজটি তার বড্ড রুক্ষ হয়ে উঠছিল। ঠিক পাঁচটার পরে বাড়ী আসলেও বলত'—তুমি বড্ড দেরী কর, বাজার করতে যেতে চাইলে বলত'—বামুনকে পাঠাও, বেড়াতে বের হতে চাইলে বলত'—ছাদের উপরে চল। এমনি কত কি।

মনে বড় আশা 'আশার' ছেলে হলে তাকে মানুষ করতে হবে। তার মাকে বাসায় আনিয়ে রাখতে চেয়েছিলুম, সে বললে—আর ক'টা দিন যাক; এতদিন কি তিনি এসে থাকতে পারবেন?

৪

সেই সন্ধ্যাটায় আর কিছুই ভাল লাগছিল না। অন্য একটি চাকর খুজে আনি বলে নদীর ধারে বেড়াতে বের হলুম। মনে শুধু একটি কথাই বার বার আলোড়ন করছিল। পুরাতন ভৃত্যের সঙ্গে আশার বনিবনাও না হওয়ার কারণ কি ?

ভজহরির দিকে চেয়ে দয়া হ'ল কিন্তু আশার সে সময়টায় কিছুতেই তাকে ব্যথা দেওয়া যায় না।

নদীর ধারে গিয়ে দেখি আমারই পরিচিত ঠিক নবরত্ন নয়, পঞ্চরত্ন এক জায়গায় ঘাসের উপর বসে আড্ডা দিচ্ছেন। ভাবলুম ওদের সঙ্গে খানিকটা গল্প করা যাক।

কাছে গিয়ে বসতেই সবাই চেঁচিয়ে উঠল, শুনছো টিকটিকী পুলিসের দারোগাবাবু এক নূতন তথ্য সংগ্রহ করেছেন। কোন সাহেবের মেম নাকি আজ তিন দিন ধরে উধাও! ভাবলুম, কুৎসিত চর্চ্চা আরম্ভ হয়েছে। বিরক্তির স্বরে বললুম,—তিনি যে বেড়াতে যান নি তা কি করে জানলে ?

টিক্‌টিকীবাবু চোখ রাঙালেন,—আমরা ত' আর কেরানী-গিরী করিনে, সত্যমিথ্যে বুঝবার মত জ্ঞান আমাদের বেশ রয়েছে। ধমক খেয়ে ভড়কে গেলুম, বললুম—চোখে না দেখে কু-চর্চ্চা করা অন্ততঃ কেরানীগিরীর বাহিরেই বটে।

পাশে হাসপাতালের ছোট ডাক্তারবাবু বসে ছিলেন। তিনি আমার গাঁয়ের উপর ভর দিয়ে হাত পা লম্বা করে

সোহাগের সুরে বললেন—বন্ধু আমার চোখে না দেখলে কিছু বিশ্বাস করেন না। নয়? শুনুন তবে। উঠে পড়বার চেষ্টা করলুম কিন্তু সবাই ধরে বেআইনী আটক করলে।

ডাক্তারবাবু প্রমাণ দিলেন—আমি তখন বারাসত সবেমাত্র গিয়েছি। হাসপাতালে একটি মাত্র নার্স! বাঙালী খ্রীষ্টান, বিধবা।

—সবাই চোখ টিপে টিপে হাসতে লাগল—আমি লজ্জায় মরে গেলুম!

—বয়স তার ৪০ বৎসর। আমি আশ্বস্ত হলুম—গল্পের নায়িকা তবে ইনি নন।

—সাথে একটি মেয়ে ১৫।১৬ বৎসর বয়স। স্কুলে পড়ছে। নার্সটি আমায় বলতো' মেয়ে নিয়ে সে বিপদে পড়েছ। ভাবতুম এর মধ্যে কিছু রহস্য রয়েছে। শুনলুম মেয়েটিকে একটি ছোকরা ভাগাতে চেষ্টা করেছিল কিন্তু স্থানীয় অফিসারদের ও নারীরক্ষা সমিতির জন্য পেরে উঠে নি।

আমি বলে উঠলুম—শুনলুম? আপনি না বলেছেন, চোখে দেখলেন? ডাক্তার বাবু ধমক দিলেন—ব্যস্ত হবেন না। বলছি, আসছে। আবার ক্ষুণ্ণ হয়ে রইলুম।

—তিন মাস কেটে গেল, হঠাৎ কয়দিন নার্সটি অসুখের অজুহাতে অনুপস্থিত র'ইল। রাত প্রায় বারটা—কে এসে ডেকে বললে—ডাক্তারবাবু, আরজেণ্ট কেস। চোখ মুছে বাহিরে এসে শুনি নার্স বেচারীর অবস্থা খারাপ!

ডাক্তারী সরঞ্জাম গুছিয়ে নিয়ে ছুটলুম। দেখি রীতিমত Abortion case,—নার্স বেচারীর নিজেরই। তার মেয়ে বিব্রত হয়ে এদিক ওদিক ছুটোছুটি করছে। মাথা ঘুলিয়ে গেল।......

সকলে হো হো করে হেসে উঠল। আমি লজ্জায় মাথাটি হেঁট করে উঠে পড়লুম। আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে সবাই বলতে লাগল, নারীর কুহক এখনও কেরানীবাবু বুঝেন নি।

শান্তির আশায় বেরিয়েছিলুম—শাস্তি নিয়ে ফিরলুম। পথে ফিরতে ফিরতে কেবলই মনে করছিলুম "বাবুজীর ঘরে চুরি হতে দেব না" এর অর্থ কি? তবে কি আমার আশা? ছিঃ তাও কি সম্ভব? সম্ভব নয় বটে কিন্তু ভজহরির প্রভুভক্তিতে ত' কোনদিন ত্রুটি দেখিনি। এর আস্কারা না করলে হয় না।

ভজহরি যে পাড়ায় থাকত আমি চিনতুম। ভাবলুম ওর ওখান হয়েই যাই না—দেখি ওকে টোকা দিয়ে যদি কিছু কিনারা করতে পারি।

তার বাসার কাছে এসেই শুনলুম ভজহরি তার স্ত্রীর সাথে গল্প করছে—প্রসঙ্গটি আমার বাড়ীরই বটে।

বাঙ্গালী মাগী—আবার ঐ কথা—জান থাকতে সে আমার ঘরে চুরি হতে দেবে না।

হঠাৎ মাথায় বাজ পড়ল। তবে কি আমার আশা? হায় কি করলি তুই? ডাকলুম—ভজহরি।

আজ্ঞে বাবু এই যে—বলে বাইরে এসেই ভড়কিয়ে গেল। সুযোগ নিয়ে দৃঢ়স্বরে ওর চোখের দিকে তাকিয়ে বল্‌লুম—ছাখ তুই জীবনে আমার সঙ্গে কোনদিন চাতুরী করিসনি। ঠিক বলবি, কিছু দেখেছিস্‌?

উত্তর হল—না সে কিছু দেখেনি। ভাব দেখে বুঝলুম একথা সত্য। ঝট্‌ করে মনটা হালকা হয়ে গেল। উঃ বাঁচা গেল।

তবে শুনেছিস্‌?

"হ্যাঁ বাবু"—কিন্তু মাফ চাইল বলতে পারবে না। উঃ সর্ব্বনাশ। আবার বজ্রপাত! বুঝলুম—জেরা করা বৃথা।

বল্লুম—ছাখ তা হলে তুই আমার হাতে হাতে ধরিয়ে দিবি, বুঝ্‌লি?

উত্তর হল, হ্যাঁ যদি পারি।

বাসায় ফিরতে দেরী হ'ল। সটান বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লুম, বললুম—মাথা ধরেছে কিছু খাব না।

আশা আদর করল—সে কি গো? ভাল মানুষটী গেলে আর মাথা ধরিয়ে বাড়ী ফিরলে। ওঠ দুটো মুখে দিয়ে নাও?

বুঝলুম ছলনা করলে। বল্‌ল, না হয় এক ফোঁটা ওষুধ—ওই যে মাথা ধরায় দিব্বি ফল হয়। ওগো বলে ফেল তোমার কেমন কেমন লাগছে—এক্ষুণি বইটে দেখে দিচ্ছি। বোধ হয় এক ফোঁটা বেলেডনা দিলেই সব সেরে যাবে।

ধমক দিয়ে বললুম—ছাই হবে। ওতে আমার বিশ্বাস নেই —বেলেডনায় আমার হবে না—আমার দরকার আরসেনিকের।

—আচ্ছা তাই না হয় মেলে কিনা দেখে দিচ্ছি—

আবার বললুম,—ঘোড়ার ডিম হবে, পার ত' কয়েক তোলা আরসেনিক বাজার থেকে এনে দাও, দিব্বি কাজ হয়ে যাবে।

নবীন হাসিয়া ফেলিল,—অহিংসা পরম ধর্ম্ম !......

হেস না ভাই—তখনকার কথা বলছি—আশাই এই জল চিকিৎসা নিয়ে নাড়াচাড়া করত, তার বেশ উপকার হতো ওতে।

৫

রাত্রে একেবারেই ঘুম হ'ল না। দুপুর রাত্রিতে ঘুমঘোরে আশা চেঁচিয়ে উঠল—ওগো আমায় ছুয়ো না, আমার ভয় করে।

বিরক্তির সুরে বললুম—ওগো তোমার চেয়ে ভয় এখন আমারই বেশী করছে। শুনল কিনা জানিনে—সে আবার তেমনি নাক ডাকিয়ে ঘুমুতে লাগল। আবার থেকে থেকে চম্‌কে উঠে আর ঘুমঘোরে বাজে বকে। জ্বালাতন আর সহ্য হচ্ছিল না।

৬

পরদিন আফিসের সমস্ত কাজকর্ম্ম গুলিয়ে দিলুম। সারাদিনটের কাজের পরিমাণ এক আনায় দাঁড়াল। কাজকর্ম্মে আর কি হবে ?

বাড়ী ফিরে সন্তর্পণে এদিক ওদিক দেখলুম। জিনিষপত্র নড়চড় হয়েছে কিনা—কয়েকটী পায়ের দাগ দেখেই আতকিয়ে উঠলুম—লক্ষ্য করে দেখি যে আমারই পায়ের দাগ!

আশা নিজের হাতে খাবার করছিল। সোহাগ করে যেন আয়োজনটা দ্বিগুণ করে রেখেছিল। খেতে মোটেই পারলুম না। জোর করলে—জবরদস্তি করলে—কিন্তু মাথা ধরার অজুহাতে সব কাটিয়ে দিলুম।

আশা অনুযোগ করল—ওগো আমার কেবল গা কাঁটা দেয় আর শুয়ে শুয়ে দুঃস্বপ্ন দেখি! মাকে আনালে হয় না? আর তুমিই বা কেমন কেমন করছ? খাবে না, দাবে না, অমন করলে অসুখে পড়ে যাবে যে।

কৃত্রিম হেসে বললুম,—তাই ত' দেখছি, তুমি শুয়ে দুঃস্বপ্ন দেখ আর আমি জেগেই দুঃস্বপ্ন দেখি! আশা অপ্রতিভ হল। বুঝতে না পেরে কেবল তাকিয়েই রইল।

সন্দেহে মন ছাপিয়ে উঠেছিল—আশার সকল কথাতেই তাই বিরক্ত হতুম!

পরদিন পিয়ন এসে চিঠি দিয়ে গেল। দেখি শ্রীমতী আশালতা দেবী, একখানা অপরিচিত হাতের লেখা চিঠি। বুঝি প্রেমপত্রই হবে।

দেখি তার মার চিঠি, কাউকে দিয়ে লিখিয়েছেন। আশার সন্তান হবে শুনে তারা কত খুশী—মা আমার চিন্তা করো না।

তোমার বাবা বাড়ী নেই। তিনি বাড়ী এলেই আমি তোমাদের ওখানে যাব। কতগুলো পুতুল কিনে রাখলুম।...ভালমত খাওয়া দাওয়া করো। শরীরের দিকে দেখো। সন্তান হলে তোমাদের একটি ভাল ঝিয়ের দরকার হবে। এখন থেকেই সন্ধানে রইলুম। তোমার স্বামী বিজ্ঞ লোক, সদ্বিবেচক, তোমার সকল প্রকার সুবিধে অসুবিধে দেখবে। তাকে স্নেহ জানিও।.....

সুখ স্বপ্ন ফিরে এল। সন্তান? সে যে আশার দান। দিন, মাস, বছর, এমনি করে কেটে যাবে—সন্তানের শিক্ষার বন্দোবস্ত দেখতে হবে।......

উঃ মুহূর্ত্তেই আবার সন্দেহের ছায়াপাত। কি নিদারুণ! জীবনেই যার সাধ নেই তার আবার সন্তান!

ব্যস্তবাগীশ নবীন যে কি অসুবিধা ভোগ করিতেছিল, তাহা বলা যায় না। অনাথের দিকে চাহিয়া তাহার গম্ভীর ভাব ও মুখের প্রতিচ্ছবি দেখিয়া সে কিন্তু বলিবার বা বাধা দিবার কোন কথা বা উপকরণই খুঁজিয়া পাইতেছিল না।

৭

অনাথ বলিয়া চলিল—সেদিন সোমবার। আফিসে গিয়ে সামান্য কিছু কাজ করছি, অমনই তেড়ে এলেন বড় বাবু। বললেন—তোমার হয়েছে কি? দু'দিন কাজকর্ম্ম সব ঘুলিয়ে দিয়েছ—চল সাহেব তোমায় ডেকেছেন।

মাথা হেঁট করে সাহেবের সামনে গিয়ে দাঁড়ালুম। তর্জ্জন গর্জ্জন সুরু হল—You silly ass! Bungled the whole file, eh? Get back and do it over again.

বড় বাবু সঙ্গে করে এনে বসিয়ে দিয়ে গেলেন। তার আত্মীয় কুটুম্বদের মধ্যে চাকুরীর আশায় অনেকেই ছিল। তাই প্রবোধ দিতে গিয়ে বললেন—ওহো কাজে মন না বসে ত মানে মানে সরে পড়গে—শেষে ডিস্‌মিস হয়ে গিয়ে একুল ওকুল ছুকুল হারাবে। ছেড়ে গেলে বরং একটা কিছু করে খেতেই পারবে। বুঝলে?

বিরক্তিতে মন ভরে উঠেছিল। লাফ দিয়ে উঠে বারান্দায় এসে পায়চারী করতে লাগলুম। কি চাকুরী? কি হবে আর খেটে খেটে আর রাঙ্গা চোখ দেখে দেখে?

হঠাৎ দেখি ভজহরি দৌড়ে আসছে। এক লাফে এগিয়ে গিয়ে বললুম—কিরে? দৌড়ছিস্ কেন?

উড়ে হাপাতে হাপাতে ইঙ্গিত করলে—তখনই তার সাথে দৌড়ে আসতে।

সর্ব্বনাশ! দপ্তরী বারান্দার এক পাশে বসে কাগজ কাটত। কি কাজে যেন আফিসে ঢুকেছিল। ছোঁ মেরে ওর ছুরিখানা নিয়ে বললুম—তুই দৌড়ে গিয়ে লক্ষ্য রাখগে। আমরা এক্ষুনি আস্‌ছি।

টিকটিকি পুলিশের নূতন দারোগাবাবুর সঙ্গে সামান্য জানাশুনা ছিল। রাস্তায়ই তার বাসা, ডাক দিয়ে বললুম,—চলুন ত ভাই বাড়ী আমার—ব্যাপারটা রাস্তায়ই বলছি।

পথে আসতে আসতে সব শুনে দারোগাবাবু বল্লেন—হাতে-হাতে ধরাটা মুস্কিল, তবে দেখা যাক্। বললুম—ভজহরিকে পাঠিয়েছি তাকে তাকে থাকতে।

ফটকের কাছে এসে দেখি ভজহরি শোবার ঘরের জানালার কাছে চুপি দিয়ে কান পেতে কি শুনছে আর মিটিমিটি হাসছে। ইসারা করলে, ঘরে কথাবার্ত্তা হচ্ছে।

উঃ সে কি মনের অবস্থা! এক লাফে ঘরের বারান্দায় উঠে লাথি দিয়ে দরজা ভেঙ্গে ঘরে ঢুকেই দেখি আশার ঘুম ভাঙ্গল! লাল তার চোখ, মলিন তার মুখ—কাঁপতে কাঁপতে বলল, আফিস থেকে এসে পড়েছ যে—কপাট ভাঙ্গল কে? শুয়ে শুয়ে কি দুঃস্বপ্নই দেখছিলুম—

এক নিমিষে সব বুঝলুম! ঐ তার ঘুমঘোরে বকবার অভ্যাস! কি জবাব দিব ভাবছিলুম—এমন সময়ে সঙ্গে সঙ্গে দারোগাবাবু ঢুকে পড়ায় আশা ঘোমটা টেনে মুখ আড়াল করল।

অবসর পেয়ে তাড়াতাড়ি চোখ টিপে বললুম—বাবু এসেছেন এই যে। উনি বড্ড দুঃস্বপ্ন দেখেন ঘুমোলে—বিড়বিড় করে কত কি বলেন—একটু দেখুন ত ওকে—

বাবু পাকা ওস্তাদ। সাদা বেশে গিয়েছিলেন এবং চিকিৎসা শাস্ত্রে তার জ্ঞান কতদূর এসব বুঝেই চট করে উপায় বের করে নিলেন। বললেন—হু—হোমিওপ্যাথী চিকিৎসা। দেখাবার বড্ড কিছু থাকে না—সব শুনলেই ধরতে পারব—লক্ষণগুলি? তা আপনিই বলবেন?

ঘোমটার আড়ালে আশার মুখের আভা লক্ষ্য করেই বুঝলুম বেঁচে গেছি।

আশা বলে উঠল—তা আমি সব সময়েই বলছি, আমায় দেখাতে হলে ভাল একজন হোমিওপ্যাথকেই ডেকো। লক্ষণগুলো তোমারও জানা আছে, ওকে বুঝিয়ে বল।

সে যে বাচা! বাপরে! হঠাৎ মনটা হালকা হয়ে গেল। হ্যানিম্যান—ধন্য তুমি! উঃ! হোমিওপ্যাথী বের না করতে পারলে কী যে দশা হত!

নবীন হাসিতে হাসিতে বাড়ী-ঘর কাঁপাইয়া বলিল—লোক বটে তুমি বন্ধু! ধন্য তোমার বুদ্ধির! রাঁচি ফাচির থেকে যাও একটু বেড়িয়ে এসগে! ভজহরি! খুব হাল্কা আরও দু' পেয়ালা চা দিয়ে যা ত'। ঐ যে আমার মন্ত্র—ঠিক কিনা বল দিকি—অহিংসা পরম ধর্ম্ম!

ডেপুটী সাহেবের সুমতি *

১

ডেপুটী আবদুল হামিদ সাহেব আজ ১২ বৎসর বাড়ী যান নাই। আজ সপরিবারে বাড়ী রওয়ানা হইলেন। মোটর যোগে ষ্টেষন হইতে পনর মাইল দূরে যে স্থানে আসিয়া পৌঁছিলেন, এখান হইতে আরও পাঁচ মাইল দুর্গম পথ অতিক্রম করিলে তবে বাড়ী পৌঁছিবেন।

অতি কষ্টে ২খানা পাল্কী যোগাড় করা হইয়াছে। পত্নী ও মাতাকে বাড়ী পাঠাইয়া দিয়া তিনি স্বয়ং ফেরৎ পাল্কীর অপেক্ষায় গম্ভীর মুখে ইতস্ততঃ পায়চারী করিতে লাগিলেন। হঠাৎ হুকুম হইল, "বেয়ারার! পাল্কী ফেরৎ আস্‌তে ঢের দেরী, চল, হাটিয়াই চলা যাক্।"—লোকজন নিঃশব্দে সাহেবের পাছে পাছে চলিল। পথিমধ্যে তিনি বৃষ্টির জলে ধূলো, বালু ও কর্দ্দমের এক অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ লক্ষ্য করিয়া চলিতে লাগিলেন। এক জায়গায় হঠাৎ পা পিছলাইয়া যাইবার উপক্রম হওয়ায় সাহেব, "ড্যাম্‌ইট" মন্ত্রোচ্চারণে পদ যুগলের এলোমেলো গতি রোধ করিয়া ফেলিলেন। লোকজন সভয়ে আরও নিঃশব্দে পা ফেলিয়া চলিতে লাগিল।

---

* মোয়াজ্জিন—১৩৩৯।

এই দীর্ঘ পাঁচটী মাইল হণ্টন করিতে করিতে সাহেব যখন বাড়ী পৌছিলেন, তখন বেলা প্রায় ২টা। সুবৃহৎ কাছারী ঘরে লোকে লোকারণ্য। আশে পাশের ছোট বড় যত লোক সকলেই আসিয়া হাজির; সকলেই সাহেবের শুভাগমনের প্রতীক্ষায় উদগ্রীব। সাহেবকে পায়ে হাঁটিয়া আসিতে দেখিয়া, সকলেই এক যোগে বাহিরে আসিল! "আচ্ছালামু আলাইকুম" রবে চতুর্দ্দিক মুখরিত হইল। সাহেব বিড় বিড় করিয়া জওয়াব দিলেন "থ্যাঙ্ক্‌ ইউ।" লোকজন অগ্রসর হইয়া বক্ষ পাতিয়া কোলাকুলী করিতে লাগিল। সাহেব কোন মতে এই জনতার ঠেলাঠেলী সহ্য করিয়া চলিয়াছেন, হঠাৎ স্থূলকায় খানসামাটীর ধীর পদচালনা দেখিয়া রাগিয়া উঠিলেন, বলিলেন, "কাম্‌ অন্‌ ইউ; জলদী দেখ, মেম সাহেব আরাম কোরেছেন কি না; আর আমার জন্য বাইরের ঘরে বিছানা কোরে দাও।" ডেপুটী সাহেবের খাবার জিনিষের সারাংশভোজী খানসামাটী কিন্তু ভূড়ি বাহুল্য হওয়ায় হাটিয়া আসিতে আরও কাবু হইয়া পড়িয়াছিল। সাহেবের কর্কশ আদেশে রুষ্ট হইয়া মুখের ঘাম মুছিতে মুছিতে বিড় বিড় করিয়া "বহুৎ আচ্ছা" ও "বহুৎ খারাবের" মাঝামাঝি কি একটা বলিয়া অসন্তোষ জ্ঞাপন করিল। বাড়ীর লোকজনের নিকট, "মক্কায় আসার ধাক্কা এত!" মন্তব্য প্রকাশ করিয়া, "কোথায় ঘর টর, দেখাইয়া দাও," বলিয়া

চীৎকার করিতে লাগিল। লোকজন সাহেবের সঙ্গে কোলাকুলী বন্ধ করিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল, বলিল, "সাহেবের বড় তকলীফ হ'য়েছে; একটু আরাম করুণ।" "আচ্ছা বেশ, পরে দেখা হইবে" বলিয়া সাহেব কড়া হুকুম দিলেন, শীঘ্র খাবার চাই এবং পাঁচটার পূর্ব্বে যেন তাঁহাকে কেহ না জাগায়।

২

ডেপুটী সাহেব এই পাড়া গাঁয়েরই ছেলে। তাঁহার বংশ পূর্ব্বের চেয়ে এখনই বেশী পরিচিত। তবে তাঁহার পিতৃকুলে ২।৪ জন বেশ খাঁটী পুরুষ ছিলেন। তিনি তত মেধাবী ছিলেন না বলিয়াই হউক বা তাঁহার পিতার অশেষ খোদা ভক্তির দরুনই হউক, তাঁহার উন্নতি কামনায় কত শতবার যে মস্‌জিদে মানত পড়িয়াছিল এবং গরীব দুঃখীর ভোজ হইয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। তিনি নিজেও অতি সোজা, সরলপ্রকৃতি ও ধর্ম্মপ্রাণ ছিলেন বলিয়াই লোকের বিশ্বাস। তবে সম্প্রতি না কি তাঁহার কিঞ্চিৎ মতপরিবর্ত্তন হইয়াছে বলিয়া চারিদিকে প্রকাশ। নিতান্ত হিতৈষী বন্ধুবান্ধব, বাল্য সহচর ও প্রতিবেশীর কাছে কিন্তু এ সব ভূয়ো ও উড়ো খবর বলিয়াই মনে হইত।

দেশ হইতে বহুবার বাড়ী আসিবার অনুরোধ গিয়াছে; কিন্তু কখনও স্বাস্থ্যের অজুহাতে দার্জ্জিলিং-এ, কখনও বা শ্যালকের জন্ম সংবাদে শ্বশুরালয়ে যাইতে হওয়ায়, ২।৪ মাসের

ছোট্ট ছুটীতে বাড়ী আসিবার প্রোগ্রামটী আর আটিয়া উঠিতে পারে নাই। এবার তাঁহার আম্মার একান্ত অনুরোধে শুধু পনরটী দিন বাড়ী থাকিয়া বাকী দেড় মাস পূরীতে কাটাইবেন বন্দোবস্ত হইয়াছে।

৩

পাঁচটার পরে চা'পান, তারপর বিবীর অবস্থা কি রকম সে বিষয়ে তীক্ষ্ণ অনুসন্ধান, মাতা কি ভাবে কোন ঘরে ঠাই লইলেন ইত্যাদি করিতে ও দেখিতে দেখিতে ছয়টা বাজিল। বাহিরে আসিয়া দেখেন, কাছারী ঘরে তেমনই কোলাহল, একটী প্রাণীও চলিয়া যায় নাই। ডেপুটী সাহেবের বাণী শুনিবে, তাহাদের আন্তরিকতার পরিচয় দিবে, ইহাই তাহাদের কামনা! সাহেব আসিয়া সকলের মাঝখানে বসিলেন।

ইতিমধ্যে ঘর্ম্মাক্ত বদনে আরও তিনটী লোক "আচ্ছালামু আলাইকুম!" বলিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। সকলেই শশব্যস্তে দাঁড়াইয়া বলিল, "আসুন চাচাজান, আসুন মুন্সী সাহেব, সাহেব ২টায়ই আসিয়া পৌছিয়াছেন।"

ডেপুটী সাহেব চাহিয়া দেখিলেন, তাঁহার চাচাজান ইউসুছ মিঞা, গ্রামের মাতবর মুন্সি শহীদুল্লাহ্ আর অপর একটী উদীয়মান বিস্তৃতললাট তেজস্বী যুবক। কাল সন্ধ্যায় রওয়ানা হইয়া ইঁহারা তাঁহাকেই ষ্টেশন হইতে আনিতে গিয়াছিলেন।

হোটেলে খাওয়ার গোলমালে ষ্টেষনে যাইতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হওয়ায় তাঁহাদিগকে না পাইয়া আবার হাটিয়াই ফিরিয়াছেন।

সাহেব বলিলেন, "এত কি দরকার ছিল? আর গেলেনই যদি তবে মোটরে গেলে এলেই হ'ত।"

ইউসুছ মিয়া উত্তর দিলেন, "বাবা! জান ত আমাদের তত স্বচ্ছলতা নাই, অথচ মনও মানে না, তাই বেড়াইয়া আস্‌লাম।"

মুন্সী সাহেবও যোগ দিলেন, বলিলেন, "ঠিক! টাকাটাও আমি দিতে চেয়েছিলাম কিন্তু ছায়ীদ ছেলেটা কিছুতেই মোটরে যেতে সম্মত হ'ল না। সে বল্‌ল 'মোটর খরচের টাকাটা আমায় দিয়ে দিন; ফাণ্ডে রেখে সৎকাজ করা যাবে।' অগত্যা তাহাতেই স্বীকার ক'রলাম।"

ছায়ীদ বলিল, "বাস্তবিকই এঁরা বুড়ো হলেও এঁদের পায়ে বেশ জোর আছে। দেখুন, হেটে ত এলেনই আবার তার উপরে জিদ্ ধরলেন, দেখা না ক'রে বাড়ী যাবেন না।"

সাহেব মনে মনে তাঁহাদের আন্তরিকতায় ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিলেন না। কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর জানিতে পারিলেন, আবু ছায়ীদ ছেলেটী বেশ বুদ্ধিমান ও কর্ম্মঠ; তার উচ্চাকাঙ্খাও আছে। দেশের ও সমাজের কাজে সে মনপ্রাণ ঢালিয়া দেয়। সে নাকি প্রতিশ্রুতি দিয়াছে যে, ডেপুটী বা অন্য একটা কিছু হইতে পারিলে সে দশের উপকার করিবে।

সে এখন ছুটিতে আছে; পল্লী-গঠন কার্য্যে তার বেশ ঝোঁক।

বুড়োরা মনে করিয়াছিল, সাহেবকে তাঁহার বাল্যজীবনের ঘটনা ও কার্য্যকলাপের কথা স্মরণ করাইয়া দিবে, যুবকেরা তাঁহার গুণগান ও স্তুতিবাদ করিয়া ধন্য হইবে, কিন্তু কাহারও ঠিক মত কোন কথা যোগাইতেছিল না। অল্প অল্প কথায় সকলেই সাহেবের কথার সমর্থন করিয়া যাইতেছিল। সন্ধ্যা হইয়া আসিল দেখিয়া সাহেব উঠিলেন, বলিলেন, "আবার দেখা হ'বে। পনরটী দিন কোনমতে কাটিয়া গেলে হয়।"

৪

রাত্রে মেমসাহেবের উত্থাপনে ও ডেপুটী সাহেবের সমর্থনে যে প্রসঙ্গটী আলোচিত হইল, তাহা হইতেছে সহর ও গাঁয়ের সমালোচনা। বৃদ্ধা আম্মাজান তর্কযুদ্ধে হারিয়া গিয়া বলিলেন, "তোমরা দুইজন, আমি একা, তর্কে কি করিয়া পারিব? পাড়াগাঁয়ে লোকজন কষ্ট করে বটে, কিন্তু চেষ্টা থাকলে অনেক কষ্টই দূর হ'তে পারে। সহরে তোমরা কত বড় বড় লোক থাক, সকলেই প্রায় শিক্ষিত, অভাব অভিযোগের প্রতীকার সঙ্গে সঙ্গেই হয়ে যায়। ভেবে দেখ পাড়াগাঁয়ের অভাব কেবল উপযুক্ত লোকের।"

মেম সাহেবের ইঙ্গিতে ডেপুটী সাহেব আলোচনা স্থগিত রাখিয়া বলিলেন, "কাল সকাল বেলা এখানকার সকলের সহিত

এ বিষয়ে পুনরালোচনা করা যাবে। আমি একাই সকলের সঙ্গে তর্ক করে দেখ্‌ব।”

পরদিন ভোর ফজরে লোকজন আসিয়া জমায়েৎ করিল। ডেপুটী সাহেবের চা’পান ইত্যাদি নিত্যকর্ম্ম করিয়া বাহিরে আসিতে আসিতে সূর্য্যদেব বেশ একটু রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। সাহেব আসন গ্রহণ করিয়াই তাঁহার সুচিন্তিত বক্তৃতা ঝাড়িলেন, “পাড়াগাঁয়ে কি অসুবিধা! নাই রাস্তা, নাই ঘাট, মনের মতন লোক মেলে না, খেলাধূলার চর্চ্চা নাই, কেবল ঘোর অভাব, অপূর্ব্ব প্রাণহীনতা। ভদ্রলোকেরা যে সহরে যাইয়া বাসা বাঁধে, তা এত অসুবিধারই দরুণ।” এই অকাট্য মন্তব্য ঝাড়িয়া একটু থামিলেন, ভাবিলেন যেমনই কেহ প্রত্যুত্তর করিতে যাইবে অমনই তাহাকে পূর্ব্বচিন্তিত তর্কধারায় নাকাল করিয়া ছাড়িবেন।

আবু ছায়ীদ ছেলেটী কি বলিতে যাইতেছিল, হঠাৎ থামিয়া গিয়া অনুমতি ভিক্ষা করিল, সে নির্ভয়ে মনোভাব ব্যক্ত করিতে পারে কি না। সাহেব অভয় দিলে সে বিস্তৃত আলোচনা আরম্ভ করিল।

পাড়াগাঁ ও সহর যে দুনিয়ার একই পৃষ্ঠের উপরের জায়গা মাত্র, সহর যে খোদাতায়ালা ভিন্ন করিয়া গড়েন নাই, বড় বড় লোক পাড়াগাঁ ছাড়িয়া গিয়া জায়গা বিশেষে জমায়েৎ করায় সহর গড়িয়া উঠে, অপরিমিত অর্থব্যয়ে অভাব অভিযোগের

প্রতীকার হয়, পরিত্যক্ত মাতৃভূমি শুধু লোকের অভাবেই বিকলাঙ্গ হইয়া পড়ে ইত্যাদি কথা ছায়াদ স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া বলায় সকলেই মাথা নাড়িয়া ভোট দিতে লাগিল।

সাহেব একটু অপ্রস্তুত হইলেন। প্রসঙ্গটি চাপা দিতে যাইয়া বলিলেন, "আচ্ছা, এখানে যে প্রায়ই লোকজন রোগে ভুগে সে নিশ্চয়ই ব্যয়ামের অভাবের দরুণ বই ত নয়? খেলাধূলা না হলে শরীর ঠিক থাকবে কি করে? আমাদের মাঠে বৈকালে খেলাধূলার জন্য চারিদিকে খবর দেওয়া হউক। আমি নিজে উপস্থিত থাকব।"

ছায়াদ বলিল, "বেশ কথা; আমি এখনই বন্দোবস্ত ক'রে দিব।" মনে মনে বলিল, এখানে শ্রমাভাবের চেয়ে অতিশ্রমই রোগের কারণ। সাহেব আরও নোটিশ দিয়া দিলেন, এখানে মাত্র পনরটি দিন থাকিবেন, পুরীতে যাওয়া একেবারে সুস্থির; তাহার অন্যথা করা যাইবে না। সকলে প্রস্থান করিল।

মধ্যাহ্নে টিফীনের কাটলেট্‌টী লইয়া নাড়াচাড়া করিতে করিতে মা'র দিকে লক্ষ্য করিয়া সাহেব বলিলেন, "তাই ত! সহর-গাঁয়ের বিষয়টী জটিলই বটে; হঠাৎ কোন সিদ্ধান্তে আসা দুরূহ।"

মা উত্তর করিলেন, "বাবা, তোমরা যদি দেশে থাক তবে দেশও সহরের মত হ'তে পারে।"

বৈকালে খেলাধূলা হইবে শুনিয়া মেমসাহেবের আগ্রহ

হইল তিনিও খেলা দেখিবেন কিন্তু পাড়াগাঁয়ের সাময়িক পর্দ্দার আবেষ্টনে যে তাঁহার চক্ষুদুটির সাধ মিটাইতে পারিবেন না তাহাও ভাবে ও ভাষায় বুঝাইতে বাকী রাখিলেন না। মা শুধু বলিলেন, "দশবৎসরে মাত্র এক দিনের আয়োজনে লাভ কি ?'

৫

বৈকাল ৪॥ টা। সাহেবের বাড়ীর দক্ষিণদিকের প্রকাণ্ড মাঠটাতে আজ লোকে লোকারণ্য। ছাত্রীদের প্রচেষ্টায় চতুর্দ্দিকের লোক আর প্রায় বাকী নাই। সকলেই সাহেবের প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে। সাহেব আসিতেই সকলে অভিবাদন করিয়া হুকুমের অপেক্ষায় রহিল। সাহেব সোৎসাহে হুকুম দিলেন, তাহারা যে যে খেলা জানে এক একটি করিয়া দেখাইতে থাকুক।

নানা প্রকার খেলা আরম্ভ হইল। লাঠি খেলা, সড়কিভাজা, ছোরাচালা, হাডুডুডু বিষম দাপটেই চলিতে লাগিল।

সাহেব আজ পরম পুলকিত। মনে মনে ভাবিতেছেন খেলাশেষে ব্যায়ামের আবশ্যকতা, শ্রমবিমুখতার অপকারিতা, রোগশোকের প্রকৃত কারণ ইত্যাদি বিশেষ ভাবে আলোচনা করিয়া লম্বা বক্তৃতা দিবেন। সকালে তাঁহার প্রস্তাবে কেহ কোন অমত করে নাই, সেজন্য তাঁহার বক্তৃতা যে খুব হৃদয়গ্রাহী হইবে সে বিষয়েও তাঁহার কোন সন্দেহ রহিল না।

হঠাৎ শহর আলী মাতবরের গগনভেদী হুঙ্কার শোনা গেল, "তবে শালাকে আলবাৎ মাফ্ নিতে হবে"। জাবেদ মিয়া ততই দৃঢ়স্বরে উত্তর করিল, "আহা! বাছাদের আর আহ্লাদ ধরে না। খেলতে না এলেই হ'ত, কুছ পরওয়া নেই!"

ছায়ীদ প্রমাদ গণিল। এ'যে দুই বিরোধী মাতবরে বেধে গেল!

অনুসন্ধানে জানা গেল, খালপারের একটী লোক এপারের একটীর পায়ের উপর হঠাৎ বসিয়া পড়ায় সে মাতবরের নিকট নালিশ করিয়াছে, "শালা ইচ্ছে ক'রে আমাকে ব্যথা দিল যে!"

দুই পক্ষে তুমুল বাঁধিয়া গিয়াছে, আর নিস্তার নাই। চারিদিকে সংবাদ গেল, এ গাঁয়ের ও গাঁয়ের বাকী লোকজন অস্ত্রসস্ত্র লইয়া আসিয়া উপস্থিত হউক। সূর্য্য ডুবিয়া গিয়াছে। তুমুল কোলাহলে কিছুই শোনা যায় না। কেবল "মার" আর "মার" শব্দ।

ডেপুটী সাহেবের মুখ শুকাইয়া এতটুকু হইয়া গিয়াছে। অপরাপর ভদ্রলোকেরা ভাবিয়া আকুল! শান্তি-রক্ষক হাকিম, কত জায়গায় কত উপদ্রব দমন করিয়াছেন; কিন্তু এখানে যে তিনি একেবারে নীরব। কাহারও আর জনতা ভেদ করিয়া গিয়া মিটমাটের কথা পাড়িতে সাহস হইল না।

এমন সময়ে হঠাৎ মুন্সী সাহেবের উচ্চ কণ্ঠস্বর শোনা গেল। "সময় হয়েছে, শীঘ্র আজান দে রে!" বলার সঙ্গে সঙ্গে মুন্সা ছাহেব দুখানা হাত উঠাইয়া ইঙ্গিত করিলেন, এ সময়ে চুপ করিতে হইবে। "আল্লাহো আকবর!" ধ্বনির সঙ্গেই সমস্ত কোলাহল থামিয়া গেল। যে যেখানে দাঁড়াইয়াছিল সে সেখানেই চুপ করিয়া রহিয়া গেল। ডেপুটী সাহেব সাময়িক নিষ্কৃতি লাভে কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেন, কিন্তু আবার যে লড়াই বাঁধিবে তাহাও বুঝিয়া শঙ্কিত রহিলেন।

আজানের পর মোনাজাৎ, তার পরেই অন্য কাহারও চীৎকার আরম্ভ করার পূর্ব্বে মুন্সী সাহেব দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করিলেন, "সময় অল্প, শীঘ্র সকলে পুষ্করিণী থেকে অজু করে এস।" কেহ দ্বিরুক্তি করিল না, গামছা ঝাড়িয়া মাথা হেট করিয়া পুষ্করিণীর দিকে চলিয়া গেল। সাহেবও বিনা ওজরে যোগদান করিলেন।

"এখন আবার তোমারা লাগিতে পার, যাও!' বলিয়া মাতবর দুটীর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া মুন্সী সাহেব নামাজের পরে দাঁড়াইয়া গম্ভীরস্বরে বলিতে লাগিলেন, "এতক্ষণ এক সঙ্গে খোদার এবাদৎ করলে, এখন শয়তানের এবাদৎ কর। যাও, নচ্ছার, পাজীরা,—আজ কাটাকাটি ক'রে না ম'রে কেউ বাড়ী ফিরতে পার্ব্বে না! ছিঃ ছিঃ সাহেবের এত সাধের আয়োজনটা একেবারেই ধূলিসাৎ করে দিলি! আমরা কি ক'রে দুনিয়ার সামনে মুখ দেখাব রে!"

ইতিমধ্যে তিন চার গ্রামের আরও বহু লোক লাঠি, বর্শা, শরকি, ইত্যাদি লইয়া আসিয়া অপেক্ষা করিতেছিল। "আরে এখনও যে তোরা খাড়া!"—সকলে প্রমাদ গণিল—"এখনও লাঠি ঠেঙ্গা ফেলে দিলি না রে!"—বলিয়া শহর আলী কম্পিত কণ্ঠে বলিতে লাগিল, "আমরা মহা পাপী, আমাদের কি উপায় হবে রে। হায় কি সর্ব্বনাশের খেলা! আয় সবাই সাহেবের পা ধ'রে মাফ নিই।"—দেখা গেল শহর আলীর দু'চোখ ভরিয়া জল আসিয়াছে। শুধু তাই নয়, সে একেবারে ছোট্ট খোকাটীর মত কাঁদিতে কাঁদিতে সাহেবের পায় পড়িল।

জাবেদ মিয়াও করযোড়ে উপস্থিত। তাহার নালিশ, সে মহাপাতকী, সাহেব তাহাকে মাফ না করিলে, সে সেখানেই জান্ দিয়া দিবে!

সাহেব ত অবাক, এ কি দৃশ্য। বলিলেন, "যা হবার হয়ে গেছে। আরও কত কি হ'তে পারতো। খোদার শোকর।"

ছায়ীদ বলিল, "সাহেব ত মাফ্ করলেন। আপনাদের মধ্যে আপোষের কি হ'ল? আসুন আপনারা দুজনে হাত মিলান!"

অমনিই উভয় উভয়কে আলিঙ্গন করিয়া বিলাপ করিতে লাগিল, "হায় আমরা মহাপাপী, জাহান্নামী, ওরে তোরা কে কোথায় আছিস রে. লাঠি ঠেঙ্গা ফেলে দিয়ে তওবা কর, আর কখনও ওসব ছুবি নে।"

মুন্সী সাহেব বাধা দিয়া দৃঢ়ভাবে বলিলেন, "তা কেন? খোদার ওয়াস্তে ধরতে হলে, আলবৎ ধরবে। এছলাম এত সামান্য কারণে ভাই ভাইর মধ্যে লড়াই করতে শিক্ষা দেয় নাই। তোমরা মিশে যাও, লাঠি তরবারী তোমাদের অঙ্গের ভূষণ হউক —বৃথা কলহ করবার জন্য নয়।"

সকলে সমস্বরে বলিয়া উঠিল, "আল্লাহো আকবর!"— ছায়ীদ বলিল,—আজ হ'তে তোমাদের মিলিত নাম হ'ল "খাদেমুল এনছান।" তোমরা সকলে ঐ চাঁদ ও সন্ধ্যাতারাকে সাক্ষী রাখিয়া বল, "আমরা এক, অটুট অক্ষয় এক, আমরা অভিন্ন, অবিচ্ছিন্নভাবে চলিব।" আবার মেদিনী কাঁপাইয়া রব উঠিল, "আল্লাহো আকবর!"

ডেপুটী সাহেব, সমিতি টমিতির গুরুভার কাঁধে পড়িবে ভয়ে "তবে আসি" বলিয়া ভারীমুখে বাড়ীর দিকে চলিলেন।

সাহেব বাড়ী আসিয়া দেখেন, উৎকণ্ঠায় স্ত্রী মুখ ভারী করিয়া বসিয়া আছেন, মাতা তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া সান্ত্বনা দিতেছেন। আদ্যোপান্ত শুনিয়া স্ত্রী বলিলেন, "বেশ! হয়েছে ত? বলি গাঁয়ে এসেছ; কয়েকটা দিন চুপচাপে কাটিয়ে যাও। গাঁয়ের ও সব সাপ নিয়ে খেলা ক'রো না।"

মা তেমনই দৃঢ়স্বরে বলিলেন,—কেন? হয়েছে কি? তারা ত খুনোখুনি করে বসে নি! বাবা তোমাদের মত লোক দেশে থাকলে কি আর ওরা খুনোখুনি করে?

৬

রাত্রে সাহেবের ঘুম হইল না। থাকিয়া থাকিয়া জনতার সেই আগ্নেয় মূর্ত্তি, সেই জ্বলন্ত উন্মত্ততার কথা মনে হইতে লাগিল। একবার স্ত্রীর কথার সমর্থনে ভাবিলেন,—তাই ত এ সব নিয়ে খেলা করা পোষায় না। কি সর্ব্বনাশের উপক্রম হয়েছিল। আমি ওখানে আছি, বেটারা ত একবার ভেবেও দেখল না। তাঁহার মনে হইল—আমলাতন্ত্রে চাকুরীর ন্যায় সুখকর বুঝি জগতে আর কিছুই নাই। হুকুম হওয়া মাত্র তামিল। এখানে ত ভেবে চিন্তে কাজ না করলে উপায় নেই। স্বয়ং সম্রাটকেও বুঝি রাগের মাথায় এরা তুচ্ছ জ্ঞান করতে পারে।......

আবার মা'র কথার সমর্থনে ভাবেন,—তাই ত! এরা ত একেবারে পশু নয়। এদেরও ত অন্তঃকরণ আছে, খোদা রছুলের ভয় আছে। যেই আজান, অমনিই সব চুপ; কৈ, নামাজে ত তারা দু'দল হয়ে খাড়া হয় নি? আহা! কি সেই মিনতি! বাঘের মত যে আস্ফালন করল, সে আবার ভুল বুঝে নিতান্ত শিশুটীর মতই কেঁদে ফেলল! এদের চালক থাকলে এদের কাছ থেকে বেশ কাজ পাওয়া যায় ত! এদের ভক্তি ও শ্রদ্ধা ত সেই আমলাতন্ত্রের মুখে "হুজুর ঠিক" মনে "মোটেই না"-র চেয়ে কত খাঁটী!

বহু চিন্তার পর রাত্রি প্রায় ১১টা ২০ মিনিটের সময়

আপাততঃ সিদ্ধান্ত করিলেন, বুঝিয়া সুঝিয়া কাজে হাত দিতে হইবে। কে জানে এরা আবার লড়াই বাঁধাইয়া বসিবে কি না।

৭

সকালে আবার তেমনি লোকজন আসিয়াছে। আজ কিন্তু সাহেব বড় গম্ভীর হইয়া গিয়াছেন। আজ যত কথাই হউক তিনি "লোকজনের" বিষয় উল্লেখ করিবেন না, পণ করিয়াছেন।

এ-গাঁয়ে শিকার পড়ে না। অতিকষ্টে একটী ঘুঘু মারিবারও সুযোগ নাই। হুগলী জেলায় একটী বড় বিলে তিনি রাশি রাশি হাস শিকার করিয়াছিলেন। তাঁহার ২টী বন্দুক আছে। ময়মনসিংহ জেলায় যে বাঘটী শিকার করিয়াছিলেন তাহার লেজটির মাথাটী কাটা ছিল ও পায়ে একটী জখম ছিল; সেটী দৈর্ঘ্যে ৭ ফিট ছিল; চামড়াটী অতি যত্নে রক্ষা করা হইয়াছে। সদর ষ্টেশন হইতে যে নদীটি তাহার বাড়ীর ২ মাইল দূর দিয়া বহিয়া গিয়াছে তাহাতে যদি বার মাস জল থাকিত তবে কত সুবিধা হইত! আবার মোটরের রাস্তাটী পাঁচ মাইল দূর পর্য্যন্ত আসিয়া হঠাৎ থামিয়া গিয়া আরও অসুবিধা করিয়াছে। ইউনিয়ন বোর্ডের ট্যাক্স দেওয়া হইতেছে কিন্তু কৈ তাহার বাড়ীর নিকটবর্ত্তী কোন যায়গায় কোন কূপ-খননত' করা হয় নাই—ইত্যাদি, ইত্যাদি দীর্ঘ আলোচনা হইতে লাগিল। লোকজন যাহারা উপস্থিত ছিল সকলেই মাথা নাড়িয়া সাহেবের কথাগুলি গিলিতে লাগিল।

মুন্সী শহীদুল্লাহ্ নিবেদন করিলেন,—সাহেব বাড়ী না আসায়, তাহাদিগকে কেউ বড় গ্রাহ্য করে না। ছায়ীদ ছেলেটী বাড়ী আসিলে তাহার দ্বারা ভুরি ভুরি নিবেদনপত্র লিখাইয়া জেলা ও ইউনিয়ন বোর্ডে পাঠান হয়; তাহার আর কোন উত্তর পাওয়া যায় না।

এমন সময় অন্দর হইতে তলব হওয়ায় সাহেব উঠিলেন ও সকলকে "পরে দেখা হইবে" ইঙ্গিত করিলেন।

শহর আলী মিঞা এক পাশে জড়সড় হইয়া বসিয়াছিল; সাহেব আপাততঃ বিদায় লইতেছেন দেখিয়া করযোড়ে খাড়া হইয়া বলিল, "হুজুর আমার একটী নালীশ"। সাহেব থামিয়া আদেশ করিলেন, "আচ্ছা তাড়াতাড়ি বলে ফেলুন।"

শ। "হুজুর, আমরা গরীব লোক, মূর্খ, উত্তর পশ্চিম চিনি না। বহুদিন বাড়ী না আসায় হুজুরের পায়ের ধূলা নিতে পারি না। এবার এসেছেন তো আমাদের সামর্থ্য কই? আমরা কি করতে পারি?"—সাহেব ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "তাড়াতাড়ি বলে ফেলুন।"

শ।—হুজুর বলছি। পাঁচজন লোকের খাওয়ার বন্দোবস্ত করেছি। হাত বিশেষ ঠেকা। বিশেষ কিছু ক'রতে পারব না। হুজুর যদি মেহেরবাণী করে কিছু— —"

সাহেবের মুখ শুকাইয়া গেল, ভাবিলেন এইবার চাঁদা ফাঁদার দরখাস্ত হচ্ছে। তা তিনি যে স্ত্রীকে মুক্ত হস্তে দান

করিবার জন্য ২৫৲টি টাকা পৃথক করিয়া দিয়াছেন, না হয় তার থেকে কিছু ফেরৎ নিয়ে দেওয়া যাবে।—বলিলেন, "কিছু সাহায্য চাই ?"

স।—না, তওবা ! খোদা আমাকে একেবারে মন্দ রাখেন নাই। আবার চাওয়া টাকা দিয়া খাওয়ানোরও কোন ফল নাই। হুজুর দয়া করে যদি কিছু ডাল ভাত কবুল কর'তেন, তাহ'লে বড়ই সর্‌ফরাজ হ'তাম।

সাহেব আশ্বস্ত হইলেন। "হোঃ হোঃ হোঃ, হাঃ হাঃ হাঃ ! আপনি এতক্ষণ তাই বলছিলেন, তা হবে এখন। বলুন কোন সময়ে ও কবে যেতে হবে ?"

স। হুজুর, কাল হুজুরের ঘড়িতে যখন দুইটা বাজবে সেই সময় গেলেই হবে। আমি পাল্কী পাঠিয়ে দেব। আর দু'চারজনও থাবে এবং হুজুরের সঙ্গে মোলাকাৎ ক'রবে বলেছে।

সাহেব খানসামাকে ডাকিয়া হুকুম দিলেন "কাল দুপুরের খানা কম করে দিতে হবে; দাওয়াৎ আছে !"—পাল্কী লাগিবে না বলিয়া দিলেন।

শহর আলী অপর সকলকে জানাইয়া দিল; সে তাহাদের বাড়ী বাড়ী গিয়া নিমন্ত্রণ করিয়া আসিয়াছে; সকলকেই যাইতে হইবে।

অন্দরে যাইতে যাইতে সাহেব হঠাৎ রাজি হইয়া গিয়াছেন

ভাবিয়া একটু অপ্রস্তুত হইয়া গেলেন। এই ত পণ করিয়াছিলেন পাঁচ বার না ভাবিয়া চিন্তিয়া এসব কাজে আর যোগদান করা হইবে না; কে জানে শহর আলী কিসের আয়োজন করিয়াছে! বুঝি আগে সে দিন তার পক্ষে যারা গলাবাজি করিয়াছে এবং লাঠীবাজির জন্য প্রস্তুত ছিল তাহাদিগকেই ভোজ দিবে। হয়তঃ সঙ্গে সঙ্গে আবার প্রতিশোধের ষড়যন্ত্র এবং জল্পনা কল্পনাও হইয়া যাইবে। তখনই তাঁহার সেই ভীষণ রুদ্রমূর্ত্তি, বিকট চীৎকার ও আস্ফালনের কথা মনে জাগিয়া উঠিল আর গা শিহরিয়া উঠিল! কি বিড়ম্বনা! তবে পরের সেই সৌম্য মূর্ত্তিখানা মনে পড়িতেই ভয় কমিল।

৮

পরদিন স্ত্রীর সহিত রসালাপে সাহেবের কখন যে ২টা বাজিয়া গেল কিছুই ঠিক রহিল না।

খানসামা যাইয়া দাওয়াতের কথা বলিতেই সাহেব চমকিয়া উঠিয়া স্ত্রীকে বলিলেন, "তোমায় বলতে ভুলে গেছি, আমার দাওয়াৎ আছে। ওঃ একটু দেরী হয়ে গেল, তা যাক বাঙ্গালীর টাইম!" বাস্তবিক পক্ষে স্ত্রীকে দাওয়াতের কথাটা বলিতে তাহার সাহস হয় নাই। পাছে তিনি হট্টগোল বাঁধাইয়া দাওয়াৎ ফেরৎ দিতে বাধ্য করেন।

স্ত্রী দেখিলেন বাধা দেওয়ার সময় উত্তীর্ণ; তাই বিড়বিড় করিয়া অসন্তোষজ্ঞাপন করিয়া বলিলেন, "আবার ফেসাদে যাবে?"

সাহেব ত্রস্তপদে দাওয়াতী বাড়ীতে ঢুকিতেই সকলে দাঁড়াইয়া সসম্মানে অভিবাদন করিল। দেখিলেন সকলেই তাঁহার জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করিতেছে ; জানিলেন, শহর আলী মাতব্বর ঘোষণা করিয়াছে, "সাহেব তশরীফ আনার পূর্ব্বে আমার বাড়ীতে কেহ যেন একটি দানাও স্পর্শ না করে। সাহেব যখন দাওয়াৎ নিয়াছেন তখন আসবেনই।" সকলেই আজ সাহেবের জন্য ঠিক সময় মত আসিয়া উপস্থিত, কেবল সাহেব নিজেই এক ঘণ্টা দেরী করিয়া ফেলিয়াছেন। তিনি মনে মনে একটু সঙ্কুচিত হইলেন।

বড় ঘরের বারান্দার উপর একখানি তক্তপোষ, তার উপরে নরম সাদা ফরাস পাতা ; চারিদিকে তাকিয়া, বেড়াগুলি ধুতি কাপড়ে পিন মারিয়া ঢাকিয়া দেওয়া হইয়াছে! ফরাসের উপরে গোলাপ জল ছিটান হইয়াছে। যথোচিত মতে পোলাও, মাংস, দই, শিরণী করা হইয়াছে। সাহেবের বিশেষ অপছন্দ হইল না, বরং টিফিন্‌টা বাড়ীতে আর একটু কম করিলে মন্দ হইত না, ভাবিলেন।

প্রায় পাঁচ শ' লোক খানা-পিনা করিল দেখিয়া সাহেব চমৎকৃত হইলেন। চর্ব্বিদার মাংস, মিষ্ট দই,—খরচ নিতান্ত কম যায় নাই। উদ্দেশ্য বুঝিলেন, তাঁহার উপলক্ষেই হইবে, তবু এদিক ওদিক অনুসন্ধানে জানিতে পারিলেন, আগেকার দিনের বিবাদের পরবর্ত্তী মিলন নাকি মাতব্বরের মনে এক বিশেষ

আনন্দ আনিয়া দিয়াছিল। তিনি সেই মিলনকে আরও ঘনীভূত করিয়া দিবার উদ্দেশ্যে নিজে সমস্ত ব্যয় ভারের দায়িত্ব লইয়া এই একত্রভোজনের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

বিদায় লইবার পূর্ব্বে শহর আলী করযোড়ে আসিয়া জাবেদ মিঞা ও বিপক্ষের অপরাপর ব্যক্তিগণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া সকাতরে সাহেবকে সাক্ষ্য করিয়া যে নিবেদন করিল তাহা বাস্তবিকই বড় হৃদয়গ্রাহী। তাহার সার মর্ম্ম এই,—তাহারা না বুঝিয়া শয়তানের প্ররোচনায় ভাই ভাই বিচ্ছিন্ন ভাবে রহিয়াছে। খোদার অপূর্ব্ব অনুগ্রহে ও সাহেবের উপলক্ষে তাহাদের যে সামাজিক মিলন ঘটিয়াছে তাহা যেন চিরদিন অক্ষুণ্ণ থাকে। তাহারা মূর্খ বলিয়া এছলামের সেই মৈত্রী ও একতার বাণীর মর্ম্ম বুঝে নাই। তাই আজ পুনরায় সাহেবকে সাক্ষী রাখিয়া তাহারা পূর্ব্ব মিলন সুদৃঢ় করিল।

অপর পক্ষীয় লোকেরাও ছল ছল চোখে আত্মনিবেদন করিল। সেই সকাতর সলজ্জ, নম্র ও মধুর ভাব বোধ করি ইহজীবনে সাহেবের আর কখনও চোখে পড়ে নাই। তিনি আশীর্ব্বাদ করিলেন, "খোদা আপনাদের মিলন অক্ষুণ্ণ রাখুন। আমার কৃতিত্ব যে ইহাতে কতটুকু তাহা বুঝিয়া আমি নিজেই লজ্জা অনুভব করিতেছি, কিন্তু আপনাদের মধ্যে আজ যে মহান ভাবের পরিচয় পাইয়াছি তাহাতে আমি আন্তরিক ভাবে সুখী।"

জাবেদ মিঞাকে ডাকিয়া সিরাজ মিঞা কি যেন গোপনে

জিজ্ঞাসা করিল। "আচ্ছা তবে সাহেবের খেদ্‌মতে নালিশ করিব" বলিয়া জাবেদ মিঞা মাথা নাড়িলেন।

রাস্তায় আসিতে আসিতে যে আলোচনা হইল তাহাতে সাহেব জানিতে পারিলেন, শহর আলী মিঞার আর্থিক অবস্থা তত ভাল না হইলেও তিনি নাকি বড়ই মুক্তহস্ত। তিনি নাকি বলিয়া থাকেন যে এমন অবস্থা তাহার যেন কখনও না হয়, যে অপর লোক তাহাকে হিংসা করে; তিনি নাকি অকাতরে সমস্ত বিলাইয়া দিয়া ফকীর হইয়া বসিতেও কিছুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করেন না। তাহার প্রতিপত্তি যথেষ্ট, এক ডাকে কয়েক গ্রামের লোক একত্র করিয়া যাহা চান করাইতে পারেন।

"আচ্ছা, ওই সিরাজ মিঞা নাকি কি নালিশ করিবেন বলছেন। উনি কে?"—সাহেবের কথা শেষ না হইতেই, ছায়ীদ বলিল, "হুজুর আর বল্‌বেন না। ওটী ওগাঁয়ের সব চেয়ে বড় ধনী, সুদের কারবার আছে, কিন্তু নেহায়েৎ কৃপণ। কয়েকটি দিন নিয়মিত ভাবে তার খেদমতে আসা যাওয়ার পরে তিনি আমাদের হাসপাতাল ফাণ্ডে ৫৲ টাকা দিয়েছেন। উনি জাবেদ মিঞার পক্ষেরই লোক। কি জানি হয়ত কাহারও কাছে পাওনা টাওনা আছে—পায় না বলে নালিশ করবে।"

সাহেব মনে মনে নিজের সহিত শহর আলীর তুলনা করিয়া লজ্জিত হইলেন। তিনি স্ত্রীকে ২৫৲ টাকা মাত্র দিয়া আশে পাশের গরীব লোকদিগকে মুক্তহস্তে দান করিতে বলিয়া

আবার উপদেশ দিয়া দিয়াছিলেন, যেন বুঝিয়া শুনিয়া খরচ করেন এবং এজন্য কয়েকটি টাকার পয়সাও দিয়া দিয়াছেন। তিনি চাকুরী পাওয়ায় পরে কত বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। গ্রামে বিবাহ দিলে বহু লোকজন খাওয়াইতে হইবে ইত্যাদি ভাবিয়া তাঁহার ভগ্নীর বিবাহ সহরেই চাকুরীস্থলে দিয়া দিয়াছিলেন। আর আজ সামান্য একটী উপলক্ষে শহর আলী প্রায় পাঁচ শ লোককে ভোজ দিয়া দিল!—এসব ভাবিয়া ভাবিয়া তিনি মনে মনে খুব লজ্জা অনুভব করিলেন।

৯

আজ ভোরে সাহেবের তবিয়ত একটু ভাল না থাকায় বাহিরে আসিতে দেরী হইতেছিল। জাবেদ মিয়া ও সিরাজ মিয়া কাছারী ঘরে বসিয়া আছে। ছায়ীদ, শহীদুল্লা প্রভৃতি লোকও আসিয়া পৌঁছিয়াছেন।

কথাবার্ত্তা আরম্ভ হইল। ছায়ীদ জিজ্ঞাসা করিল, "সিরাজ মিয়া নাকি কি বিষয়ে সাহেবের নিকট নালিশ করবেন, বলেছেন।"

সি—"হাঁ, আপনাদেরেও আমার বলতে হবে। এ গরীবের বাড়ীতে সকলের কিছু খানা কবুল করতে হ'বে। আমি এ গ্রাম ও গ্রাম সকলকেই দাওয়াৎ করে ফেলেছি, এক্ষণ সাহেবকে বলে, আপনাদের পাড়ায় দাওয়াৎ করতে যাব মনে করেছি।"

ছা—“কত লোকের আয়োজন করলেন? তা সব ঠিকঠাক হ'য়ে গিয়েছে?”

সি—“হাঁ, প্রায়ই, বাকী যা' আছে আগামী কালের পূর্ব্বেই সেরে ফেলব।”

অনুসন্ধানে জানা গেল, সিরাজ এবার বড় একটা আয়োজন করিয়া ফেলিয়াছে। প্রায় পাঁচশত লোকের বন্দোবস্ত। ১০০৲ টাকায় কুলাইবে না।

ছায়ীদ মুন্সী সাহেবকে ইঙ্গিত করিলেন। একটু দূরে সরিয়া গিয়া দুই জনে পরামর্শে বসিলেন। বহুক্ষণ কথাবার্ত্তা সারিয়া যখন ফিরিলেন, তখন সাহেবও আসিয়া পৌঁছিয়াছেন।

সিরাজ মিয়া দাঁড়াইতেই জাবেদ মিয়া জড়সড়ভাবে নিবেদন করিলেন, “হুজুর আমাদের সিরাজ মিঞা কিঞ্চিৎ খানার যোগাড় ক'রেছেন, হুজুর মেহেরবানী করে কিছু খানা কবুল কর্‌লে বড়ই সর্‌ফরাজ হই।”

সাহেব বলিয়া উঠিলেন, “আচ্ছা বেশ ত, কবে?” মুন্সী শহীদুল্লা সাহেব দাঁড়াইয়া নিবেদন করিলেন, ছায়ীদ মিঞা একটী প্রস্তাব করিয়াছে। তাঁহার অমত না হইলে প্রস্তাবটী খুলিয়া বলিতে পারে।

সাহেব সম্মতি দিতেই, তিনি বলিয়া গেলেন, “হুজুর, আমাদের মিলন বেশ দৃঢ় হ'য়ে গেছে। সে দিন চাঁদ তারা সাক্ষী রেখে, আপনাকে সাক্ষী রেখে, আমরা মিলে মিশে

গিয়েছি, এখন আবার বড় একটা ভোজের আয়োজনে টাকা পয়সা নষ্ট করা বাহুল্য ছাড়া আর কিছুই হবে না। অনুমতি হলে সিরাজ মিঞার নিকট থেকে খাওয়া লওয়ার কয়েকটা টাকা ভিক্ষা চাই। তাহা ফাণ্ডে রেখে পরে বিবেচনা ক'রে একটা কিছু করা যাবে। হুজুর জিজ্ঞাসা করুন, সিরাজ মিঞা এ ব্যাপারে কত টাকা ব্যয় করবেন বলে ঠিক করেছেন।"

সাহেব বলিলেন, "বেশ তাই ত ভাল, আমরা এতে খাওয়া লওয়ার চেয়েও বেশী খুশী হব। তা বলুন সিরাজ মিঞা, জাবেদ মিঞা, এতে আপনাদের মত কি ?"

জাবেদ মিঞা একটু চিন্তিত হইয়া উত্তর দিলেন, "এটা ভাল কথাই বটে ; আপনারা যাতে সন্তুষ্ট থাকেন, তাইত আমাদের ক'রতে হবে। কেমন সিরাজ মিঞা, এতে কি আর আমাদের কিছু আপত্তি থা'কতে পারে ?"

সিরাজ দেখিল, খাওয়া লওয়ার ধুমধাম চুকিয়া গেল, তার পরিবর্ত্তে নিজ হাতে কাঁচা টাকা দুই তিন শ' গণিয়া দিতে হইবে। কি বিড়ম্বনা! যাক, কপালে দণ্ড ছিল, তাই সে এতে মাথা দিয়াছে ; প্রকাশ্যে বলিল, "হাঁ আমিও এতে খুব খুশী, তবে, এ গাঁয়ে ও গাঁয়ে সব দাওয়াৎ হয়ে গিয়েছে, তার কি উপায় হবে ?"

মুন্সী সাহেব জানাইয়া দিলেন, তিনি তাহার বন্দোবস্ত করিবেন, লোক পাঠাইয়া সকলকে জানাইয়া দেওয়া হবে

এবং তাহার টাকা দিয়াই লোকজন একত্র করিয়া সাহেবের হাতে হাসপাতালের ভিত্তি স্থাপনের কাজ করাইয়া লইবেন।

সিরাজ মিঞা মনে মনে খুশী হইল, তাহারই অতবড় দানটা সকলে জানিবে, হাসপাতালে তাহার নাম থাকিয়া যাইবে,—এক অপূর্ব্ব আহ্লাদে সে আটখানা! জীবনে সে কখনও হাত খুলিয়া খরচ করে নাই, এবার না হউক কিছু টাকা যাইবে—কিছুক্ষণ ভাবিয়া সে সাহসে ভর করিয়া বলিয়া ফেলিল, "হ্যাঁ, তা আপনারা এ হতভাগাকে এতদূর বাড়াবেন, তা কি কখনও মনে ক'রতে পেরেছি? আর ভোজেরও কয়টি টাকায় এত বড় কাজের কিইবা হবে? তা সাহেব হুকুম ক'রলে শ' পাঁচেক টাকাই খেদমতে হাজির ক'রে দেব।"—সকলে মারহাবা' মারহাবা' বলিয়া উঠিল। সাহেব সহাস্যে বলিয়া উঠিলেন, "তা এই মহৎ কাজে আপনার মত এত বড় দান আর কে ক'রতে পারবে? আপনার হিম্মতের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ দিই।"

সিরাজ মিয়া জাবেদ মিয়া সহ সহাস্যে প্রস্থান করিলে আলোচনা হইল, ছাত্রীদের পড়ার খরচ বাবদ কিছু সাহায্য চাওয়াতে সিরাজ মিঞা নাকি রোজার ফেৎরার দেড়টী টাকা দিয়া প্রকাশ করিয়াছিল,—তাহারও ত ছোট ২ বৎসরের শিশুটি বড় হতে চল্‌লো, তার পড়ার ব্যয়ের সংস্থান এখন থেকে না করলে চলবে কি ক'রে?

সাহেব অমন একটা লোকের পক্ষে এত বড় দানটা করিয়া ফেলার কথা সবিস্ময়ে ভাবিতেছেন এমন সময়ে—"মোটের উপর কথা এই, সাহেবের সামনে পাকড়াও করা হ'ল ব'লে তার টাকা পয়সার কিঞ্চিৎ সদ্ব্যবহার হ'ল"—বলিয়া মুন্সী সাহের মন্তব্য প্রকাশ করিয়া আলোচনার সমাপ্তি করিলেন।

এই সময়ে 'হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ' শব্দে হঠাৎ একখানি পাল্কী আসিয়া পৌঁছিল। সকলে "কে আসিল, কে আসিল,' বলাবলি করিতেই দেখা গেল, রায়-পাড়ার জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু কেদারেশ্বর রায় চৌধুরী মহাশয় সস্ত্রীক জন ৩।৪ পেয়দা পরিবৃত হইয়া আসিয়াছেন। তাঁহার পরিধানে মিহি সূতার ঢাকাই কাপড়, কাঁধে গরদের একটি চাদর, হাতে হস্তি-দন্তের বাঁটওয়ালা একটি লাঠী। বেশ সুন্দর সুপুরুষ! বাড়ীর কিছু দূরে থাকিতেই বাবু সাদা কার্ডে নামধাম লিখিয়া একটি পেয়াদার হাতে দিয়া ইঙ্গিত করিলেন, সাহেবের খানসামাকে ডাকিয়া এখনি সাহেবের হাতে পৌঁছাইয়া হুকুম লইয়া আসিবে। বাবু পায়চারী করিতে লাগিলেন। সাহেব ভাব বুঝিয়া পেয়াদাকে ডাকিয়া বলিলেন, "তোমার বাবুকে এখখুনি আসতে বল।"

ইনি রায় পাড়ার জমিদার। সাহেবের পিতার সঙ্গে ইহার বিশেষ পরিচয় ছিল। ইঁহারাই সকলের একমাত্র মালিক ও মনিব।

বাবু আসিয়া আসন লইবার পূর্ব্বেই নিবেদন করিলেন, তাহার স্ত্রী মেম সাহেবের সহিত দেখা করিতে আসিয়াছেন। সাহেব পাল্কী অন্দরে লইয়া যাইবার জন্য হুকুম দিলেন।

সাহেব ও বাবুর মধ্যে আন্তরিক ভাবেই কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। সাহেব বাড়ী আসেন না, তজ্জন্য তাঁহারা সকলেই দুঃখিত থাকেন, গরীব প্রজাদের অবস্থা কিসে উন্নত হইবে সে বিষয়ে চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার মস্তক শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, কিন্তু কোন উপায় ঠিক করিতে পারেন নাই ইত্যাদি বহু আলোচনার পরে বাবু জানাইয়া দিলেন যে, সাহেবের উদ্যোগে যে গ্রাম্য হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হইতে যাইতেছে, তাহাতে তাঁহারা কিঞ্চিৎ দান করিবেন বলিয়া ঠিক করিয়াছেন। সাহেব যদি ইহা অনুগ্রহ করিয়া এই মহা অনুষ্ঠান উপলক্ষে গ্রহণ করেন তাহা হইলে তাঁহারা ধন্য হইবেন।

জমিদার মহাশয় ও তাঁহার পত্নী চলিয়া গেলে অন্দর হইতে সংবাদ আসিল, মেম সাহেবের নিকট জমিদার পত্নীও হাসপাতাল বাবদে পাঁচ শ' টাকার প্রতিশ্রুতি দিয়া গেলেন।

সাহেব হঠাৎ এই দান বাহুল্যের কারণ বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। কারণ আর কিছুই নয়। সাহেব গাঁয়ে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন অবধি বাবুর চিত্তে একটু অস্থিরতা দেখা দিয়াছে। তাঁহার প্রজা-শাসন কাজটি এতকাল নিষ্কলঙ্ক ছিল না। লোকদিগকে খাজানা না দিলে, আদালত না করিয়া

ধরিয়া লইয়া গিয়া বাড়ীতে আটক রাখা, বাজার হইতে দু'গুণ তিন গুণ দামের কাপড় চোপড় ও অন্যান্য পণ্যদ্রব্য ছিনাইয়া লওয়া, জরিমানা আদায়, জুতা পেটা ইত্যাদি অনেক কাজই তাঁহার আমলাতন্ত্রে প্রশস্ত ছিল। সাহেব বাড়ী আসিলে এসব শুনিবার ও বুঝিবার অবসর তাঁহার নিশ্চয়ই হইবে। আবার তার উপরে এখানকার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট নাকি সাহেবের জানা শুনা লোক। তাই বিষম বিড়ম্বনা দেখিয়া কাল সন্ধ্যায় স্ত্রীর সম্মুখে তাঁর বিদ্যা-গজ-গজ্, বুদ্ধি-ঠন্-ঠন্, প্রধান মন্ত্রী বা নায়েব হলধর বিশ্বাসকে ডাকিয়া যে পরামর্শ করিয়াছিলেন, তাহার সার মর্ম্ম ছিল এই,—সাহেব এ সম্বন্ধে সকল শুনিয়া চটিবার পূর্ব্বে একবার দেখা দিয়া একটা কিছু দানটান করিয়া আসিতে হইবে। সাহেবেরা মেম সাহেবদের কথায় উঠেন ও বসেন; সুতরাং জমিদার পত্নীও স্বয়ং যাইয়া মেমসাহেবকে রাজি করাইয়া আসিবেন। জমিদার বাবু ৫০০৲ ও তৎপত্নী ৫০০৲ টাকা সাহেব ও মেমসাহেবকে গ্রহণ করাইতে পারিলে সহসা আপদ চুকিয়া যায়—একথাও আলোচনা হইয়াছিল। কিন্তু শেষে বাবুই ৫০০৲ টাকা সাহেবের সম্মুখে ধরিবেন কথাটা যখন পাকাপাকি হয় তখন জমিদার পত্নী কার্য্যান্তরে গিয়াছিলেন; তাই স্ত্রী পূর্ব্ব কথাই বহাল রাখিয়া কাজ শেষ করিয়া গিয়াছেন।

বাবু বাড়ীতে পা দিয়াই যখন জানিতে পারিলেন, দুই হাতে ১০০০৲ টাকা নামিয়া গিয়াছে তখন রাগে গর গর করিতে

লাগিলেন। স্বামী স্ত্রীতে বিষম কোন্দল বাঁধিবার উপক্রম দেখিয়া হলধর বাবু তাড়াতাড়ি উপস্থিত হইয়া ঘাড় পাতিয়া চীৎকার করিয়া বলিল, "বাবু, কি হয়েছে! মা'র কি দোষ? আমাদের পরামর্শ বৈঠকের শেষ মন্তব্য মা'কেত' জানান হয় নাই। তা যাক্ না! সাহেব বার বৎসরে বাড়ী এসেছেন; আবার আসতে বহু দেরী; এযাত্রা চলে গেলে আমরা বহু টাকা তুলে নিতে পারবো।" বাবু আপাততঃ আশ্বস্ত হইলেন।

১০

আরও দিন কয়েক চলিয়া গিয়াছে। গত দুইদিন যাবৎ সাহেব আর বাহিরে আসেন নাই। অনুসন্ধানে সকলে জানিতে পারিল, সাহেবের তবিয়ৎ ভাল নয়। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তাঁহার মানসিক অস্থিরতাই শারীরিক অবসাদের কারণ। তিনি অবিরত ভাবেন আর ভাবেন।

সম্মুখে গ্রাম্য হাসপাতাল না কি একটার ভিত্তি স্থাপন কাজে তাঁহাকে সভাপতির ভার গ্রহণ করিতে হইবে, তাঁহারই মুখ দিয়া সকলকে শুনাইতে হইবে, যে আজন্ম ৫৲ টাকা দান করে নাই সে আজ ৫০০৲ টাকা দান করিয়া এই কাজের সূচনা করাইয়া দিল, গ্রাম্য জমিদার ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী হইয়াও অযাচিত ভাবে আসিয়া ১০০০৲ টাকা দান করিয়া গেল। আর তিনি? তিনি কি করিবেন? নিজ গাঁয়ে তিনি কখনও বিশেষ একটা দান করেন নাই! সহরে সাহেবদের পাল্লায় পড়িয়া হয়তঃ কিছু

কিছু চাঁদা দিতে হয়, কিন্তু ছুটীতে তাহাও বাঁচিয়া যায়। এবার মাসে ২৲ টাকা করিয়া দুই মাসে হাসপাতালের চাঁদা ৪৲ টাকা বাঁচিয়া যাইবে ধরিয়া তিনি সে অঙ্ক আয়ের দিকে বসাইয়া বাজেট করিয়াছেন। বিবিকে যে কয়টী টাকা মুক্তহস্তে দান করিয়া গ্রামের অভাব সম্পূর্ণভাবে ঘুচাইয়া যাইবার উপদেশ দিয়াছিলেন তারও ত প্রায় অর্দ্ধেকের বেশী খরচ হইয়া গিয়াছে। আবার সভায় গ্রাম্য লোকদেরে বুঝাইবেন কি? এরা ত আর সুচিন্তিত দার্শনিক বক্তৃতা শুনিতে চাইবে না? আবার পাড়াগাঁ সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞানও বিশেষ গভীর নয়, শেষে না হয় "ধান গাছের তক্তা" গোছের একটা কিছু বলিয়া হাস্যাস্পদ হন!

যাঁহাদের হাজার হাজার টাকা আয়, তাঁহারা খরচ বাহুল্যে বিমুখ নন্ একথা আমরা জানি। দেশ-ভ্রমণে, শৈল-বিহারে বা নির্দ্দোষ আমোদ প্রমোদে টাকা পয়সা বিস্তর উড়িয়া গেলেও কোনরূপ চিত্ত বৈকল্য উপস্থিত হয় না বটে; তাই বলিয়া এককালীন দশবিশ টাকা স্ফূর্ত্তিবিহীন কোন নিরস কাজে দিয়া ফেলিতে বুকটী দুরুদুরু করিয়া উঠে, এ কথাও সকলের অবিদিত নয়। তাই সাহেবের আজ ঈদৃশ চিত্তবৈকল্য উপস্থিত!

১১

দুইদিন পরে আজ ভোরে এক সমস্যার চূড়ান্ত করিতে পারিয়াছেন। খানসামাকে ডাকিয়া হুকুম করিলেন, "শীঘ্র

মুন্সী সাহেব ও ছায়ীদকে ডেকে দাও।” সে চলিয়া গেলে, সাহেব বাহিরে আসিয়া পাইচারী করিতে লাগিলেন, অস্ফুটস্বরে বলিলেন, “যাক্ গাঁয়ে একবার বেড়িয়ে আসা যাক্। ফার্ষ্ট হ্যাণ্ড নলেজ হবে'খন।”

মুন্সী সাহেব ও ছায়ীদ আসিলেই সাহেব অভিপ্রায় জানাইয়া সম্মুখে চলিতে লাগিলেন। তাঁহারা দুইজনে, “আচ্ছা, কষ্ট হ'বে যে,—তা, একটু আগে খবর দিয়ে দিতাম” বলিতে বলিতে সাহেবের পশ্চাতে চলিলেন।

কয়েকখানা বাড়ী অতিক্রম করিয়াই, তাঁহারা একখানা নিতান্ত জীর্ণ কুটীরের পার্শ্বে পৌঁছিলেন। সাহেব থামিয়া গিয়া বলিলেন, “যান, একটু খবর দিয়ে দিন।”

ভাঙ্গা খড়ের ঘরের বারান্দায়, মাটির উপরে, ছেড়া কাঁথার আবেষ্টনে, রুগ্ন আয়েৎ আলী এইমাত্র বিলাপ করিয়া একটু শ্বাস ছাড়িয়া লইতেছিল; ছায়ীদের সংবাদে আবার বিষম আর্ত্তনাদে বাড়ীটা কাঁপাইয়া তুলিল,—হায়, বলিস কিরে! সাহেব আমার বাড়ীতে? হ্যা, তাও কি হ'তে পারে? হ্যা, আমি কোথায় যাবো! আমার সর্ব্বনাশ! আমি এখন সাহেবকে কি খেতে দিবো? বাবা জামাল! দেখত'রে গাছে ডাব-টাব আছে কি না? পেড়ে নিয়ে আয়ত'! হায় হায় আমার কি হবে রে!

জামাল দৌড়িয়া আসিয়া মাথা হেঁট করিয়া রহিল। তাহার

ছোট্ট ভাইটী বলিয়া উঠিল, "হুঁ, সেদিন না গাছ শুদ্ধ ডাব পেড়ে নিয়ে বাজারে বিক্রী দিয়ে কোবরাজকে শোধ দিলে! এখন চুপ ক'রে রইলে যে?"

আয়েৎ আলীর দুঃখের সীমা রহিল না। সে আরও বিকট-স্বরে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। সাহেবের শুনিতে আর বাকী রহিল না। তিনি পা বাড়াইয়া, "আহা কি আরম্ভ করেছ!—এখনই চা খেয়ে এলুম" বলিয়া একেবারে সামনে উপস্থিত হইলেন।

আয়েৎ আলী অতি কষ্টে উঠিয়া বসিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বলিতে লাগিল, "হ্যা! তাত বলবেনই। আজ আমার কপালে যা হবার হয়ে গেল। আমায় কেন গোর দিতে এলেন না?"—সাহেব বাধা দিয়া বলিলেন, "তোমার কি হয়েছে, তাই দেখতে এলুম। অন্য দিন দাওয়াৎ খেতে আসব।"

পনরটী মিনিট কাঁদিয়া কাটিয়া তবে সাহেবের কথার উত্তর দিল। এবার হাড়ভাঙ্গা খাটুনী খাটিয়া খাটিয়া হঠাৎ একদিন তাহার জ্বর হইল। জ্বর লইয়াই আরও খাটিতে খাটিতে যখন বিছানায় পড়িতে হইল এবং তাহার দশদিন পরে অগত্যা যখন কাব্যতীর্থ বাক্যাব্যর্থ কবিরাজ মহাশয়কে দেখান হইল তখন শক্ত ব্যারামের অজুহাতে তিনি লম্বা এক ফর্দ্দ পেশ করিলেন। ফর্দ্দের উপযুক্ত সম্মান হইবে না জানিতে পারিয়া নাকি কবিরাজ মহাশয় বলিয়া দিয়াছেন, ব্যারাম সারিতে বহু দেরী হইবে।

তাই ধৈর্য্য ধরিয়া কবিরাজের সাময়িক আশ্বাসের উপর ভর করিয়া পড়িয়া আছে! কবিরাজ মহাশয়ের অন্য একটী ফর্দ্দের নির্দ্দেশমত সে কত তুলসী গাছের বংশ নিপাত করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। ব্যারাম কিন্তু বাড়িয়াই চলিয়াছে। হাতে পয়সাটিও নাই। এখন শুধু খোদা ভরসা।

বেড়ার ওদিক হইতে ফিস্ ফিস্ শব্দ শোনা গেল। ছোট মেয়েটিকে দিয়া গৃহিনী আয়েৎ আলীর শিয়রের নিকট হইতে যে মিছরীর পোটলাটী নেওয়াইল তাহা স্পষ্টই সাহেবের চোখে পড়িল।

কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পরে সাহেব উঠিবেন, এমন সময়ে বাটায় করিয়া কয়েকটী সাজান পান ও এক গ্লাস সরবৎ আনিয়া আয়েৎ আলীর ছোট মেয়েটী আসিয়া দৃঢ়ভাবে বলিল, এর কিছু না খাইয়া সাহেব কিছুতেই যাইতে পারিবেন না। সাহেব তাহাদের মন রক্ষা করিবার ছলে, গ্লাসটী ঠোটে ঠেকাইয়া একটি পান হাতে লইলেন। অমনিই সাহেবের শরীরের রক্ত জল হইয়া আসিল। তিনি ভাবিলেন, গ্লাসটীতে গরীবের সমস্ত সৌজন্য সৌহৃদ্যের নির্যাস রহিয়াছে, তার মনের শান্তি, আত্মার তৃপ্তি সকলই ইহাতে বিজড়িত! মুহূর্ত্তমধ্যে তাঁহার ছল যে ধরা পড়িয়া গিয়া গরীবের বুক ভাঙ্গিয়া দিবে, তাহার জীর্ণ শীর্ণ রোগতপ্ত শরীর এক অপূর্ব্ব ব্যাথায় জ্বালাইয়া ছারখার করিয়া দিবে! তিনি গ্লাসটি আবার তুলিয়া চোখ মুদিয়া সব নিঃশেষ

করিয়া কাতরবিহ্বল ছল ছল চোখে বলিলেন, "আচ্ছা, তবে এখন আসি।"

উঠান হইতে কয়েক পা নামিয়াই, সাহেব কোন্‌দিকে যাইবেন ভাবিয়া একটু থমকিয়া দাঁড়াইলেন। আবার আয়েৎ আলীর সেই ভগ্ন কণ্ঠস্বর শোনা গেল,—বাবা, জামাল আমাদের ত যা হ'বার হ'য়ে গেল কিন্তু অপর লোকজন ত এম্‌নি ক'রে ঠকে যাবে। তুই দৌড়ে যা'ত বাবা. ব'লে আয়, সাহেব গাঁয়ে বেরিয়েছেন, সকলের বাড়ীতেই যেতে পারেন।

সাহেব মুন্সী সাহেবের ইঙ্গিত মতে চলিতে লাগিলেন। কয়েক বাড়ী অতিক্রম করিয়া গাঁয়ের শেষপ্রান্তে যে বাড়ীটিতে আসিলেন, সেখানকার অবস্থা দেখিয়া তাঁহার বড়ই দুঃখ হইল। জীর্ণ খড়ের ঘরটি, ভাঙ্গা তার বেড়া, বাড়ীময় জঙ্গল, উঠান বলিতে কিছু নাই! বারান্দায় বসিতেই নিঃশ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হইল। বাড়ীতে ছেলেপেলে আছে, তাহাদের চীৎকারে কান ঝালাপালা হইয়া যাইতে লাগিল।

ভুলুর মা বৃদ্ধা, বিধবা। তাহার ৭।৮ টী ছেলে মেয়ের মধ্যে মাত্র ছেলে রসিক চন্দ্রই বড় হইয়াছিল। সে ও তাহার স্ত্রী আবার উভয়েই কলেরায় মারা পড়ে। তাহারা ত কঠিন সংসার হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছে কিন্তু ৩।৪ টী অসহায় ছোট ছোট ছেলে মেয়ে বৃদ্ধার ঘাড়ে চাপাইয়া যাইতে ভুলে নাই। বৃদ্ধা যে কি করিয়া দিন চালায় সে ভগবানই জানেন!

সাহেব বারান্দায় বসিতেই কাচ্চা বাচ্চার কাঁদা কাটি শুরু হইল! কেহ কেহ আবার "সন্দেশ, সাহেব সন্দেশ এনেছেন, আমায় দাও, খাব" বলিয়া বিলাপ করিতেছে।

সাহেব সন্দেশের কথা শুনিয়া লজ্জিত হইলেন। তিনি শুধু হাতে গিয়াছেন,—সন্দেশের কথা আবার উঠিল কি করিয়া!

বৃদ্ধার দীর্ঘ আত্মনিবেদন শুরু হইল। তাহার ছেলে মেয়েরা হারাধনের দশটী ছেলের মত একটী একটী করিয়া কি ভাবে প্রাণত্যাগ করিয়াছে, অবশেষে পর পর ছেলে রসিক চন্দ্র ও তাহার বৌও কি করিয়া কলেরার সুযোগ লইয়া তাহাকে ফাঁকি দিয়া সরিয়া পড়িল,—ইত্যাদি ইত্যাদি বলিতে বলিতে বৃদ্ধার চোখ দিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। দার্শনিকের মত সে হঠাৎ সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল,—"হ্যা, বাবা, ভগবান না দয়াময়?—হ্যা, তা বৈ কি? নইলে কাচ্চা বাচ্চাদের দেখবার জন্য অন্ততঃ আমায় ত রেখে দিয়েছেন। মা বাপ হারা ওদেরে দেখেই ত আমি বেচে আছি। কি কষ্ট করে যে ওদেরে বাঁচিয়ে রেখেছি সে আমিই জানি! কিন্তু এখন ও ত বেচে আছি। দয়াময়! আর কত কাল এমনি করে কাটবে?"

সাহেব ব্যথিত হইলেন। চিকিৎসার অভাবে গাড়াগাঁয়ে যে কত জীবন নষ্ট হয় তাহা ভাবিয়া বলিলেন,—"মা, সকলই ত

শুনলুম। তা শুনেছ? তোমাদের গাঁয়েই একটা হাসপাতাল হতে যাচ্ছে......"

সাহেবের কথা কাড়িয়া লইয়াই বৃদ্ধা চীৎকার করিয়া উঠিল,—হ্যা, তাত হবেই। এখন আর হবে না? আর আমার কোলের সোনার টুকরোদেরে যে এক একটি করে শ্মশানে তুলে দিয়েছি—তখন? ও হাসপাতালের এক বিন্দু ঔষধও যদি এই বুড়ি ছোঁয় তবে—

সাহেব বলিলেন, "ছিঃ তোমার নাতী পুতী রয়েছে—তোমার পাড়াপ্রতিবেশী রয়েছে, আত্মীয় কুটুম্ব রয়েছে, তাদের ত উপকার হবে। ......আচ্ছা, এখন উঠি।"

—বৃদ্ধা হঠাৎ ঘরে ঢুকিয়া কয়েকখানা সন্দেশ ও এক গ্লাস জল লইয়া বাহির হইল। এতক্ষণে সাহেব সন্দেশের কথা বুঝিতে পারিলেন! বলিলেন,—এবার আর তোমায় রাগ না করে পারবো না। বল, এসব কী করেছ—শীঘ্‌গীর করে বল।

বৃদ্ধা দাবী করিল,—আগে, দু'টো মুখে দাও—তার পরে রাগ ক'রো।

—গরীবের একি আয়োজন! সাহেব আর কথা বলিতে পারিলেন না।......

১২

সাহেবের বাড়ী ফিরিতে ফিরিতে অনেক দেরী হইল।

মেমসাহেব পাকড়াও করিলেন,—বেশ, এলে দশ গাঁ বেড়িয়ে? তা শীঘ্রগীর স্নান ক'রে এস—ব্রেক্‌ফাষ্ট তৈয়ার।

সাহেব বলিলেন,—তোমরা খাও। আমার দেরী আছে। গাঁয়ের লোকেরা কিছু কিছু না খাইয়ে ছাড়লে না।......

—কী বল্‌লে?—গাঁয়ে আবার খেতে বসলে? যাও বল্‌ছি, আগে স্নান করে আস। স্যাঁৎস্তেঁতে, জঙ্গলময়, পাড়া গাঁ বেড়িয়ে রোগের বীজ নিয়ে এলে...আবার বলে কি না—খেয়েও এসেছেন! উঃ তোমায় পাড়া গাঁ থেকে বাঁচিয়ে নিয়ে যেতে পারবো কি না খোদাই জানেন!

মেমসাহেব স্বাস্থ্য, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, যেখানে সেখানে খাওয়া ইত্যাদির স্বপক্ষে ও বিপক্ষে বক্তৃতা ঝাড়িলেন। উঃ ডাক্তার সেন এখানে নাই! থাকিলে সাহেবের পেটে ও পিঠে প্রতিষেধক কত ইন্‌জেক্সনই দিয়া দিবার ব্যবস্থা করিতেন!

বৈকালে ভুলুর মা আসিয়া মেমসাহেবকে প্রণাম করিল—বলিল,—মা, তুমি ঐ যে আমায় টাকাটা দিলে! উঃ ওটা আমার জাত বাঁচালে!......

কী বলছ? কেমন করে?

—ওঃ তা আর বলতে? আজ সকালে পাড়ার রাখাল ছোড়াটাকে চাল কিন্‌তে বাজারে পাঠিয়েছি, অমনই জামাল ছোকরাটা এসে খবর দিল,—সাহেব গাঁয়ে বেরিয়েছেন—

আমার বাড়ীও আসতে পারেন। উঃ কী দৌড়েই না আমি গিয়ে ওকে রাস্তায় ধরলাম্—বললাম্, যা ত বাবা দেবুর দোকান থেকে ভাল কয়েকটী সন্দেশ নিয়ে আয় ভরে! রক্ষা, দেবুর ওখানে কয়টা সন্দেশ মিলল, নইলে আমি লজ্জায় মরে যেতাম্! হ্যা, মা, মরতে ত একদিন হবেই, কিন্তু তাই বলে সাহেব আমার বাড়ী থেকে খালি মুখে......

মেমসাহেব এবার সব বুঝিলেন! তাঁহার চোখে জল আসিল। বলিলেন,—কৈ, ভুলুর মা, আমায় তোমাদের বাড়ী নিয়ে খাওয়ালে না? আমি কি তোমাদের কেউ নই?—

বৃদ্ধা চীৎকার করিয়া উঠিল,—তুমি?—তুমি মা, আমাদের পায়ের ধূলো দিবে?—এ কথা ত' স্বপ্নেও ভাবতে পারবো না।

মা আসিয়া পড়ায় মেমসাহেব বৃদ্ধার সন্দেশের ব্যাপার খুলিয়া বলিলেন। মা বলিলেন,—আমি পাড়াগাঁয়েরই একজন। ওদেরে মা আমি ভাল করেই চিনি। ওরা গরীব হতে পারে; কিন্তু মন, মা, ওদের বড্ড উচু!

১৩

পরদিন সকালে গ্রামে হাসপাতালের ভিত্তি স্থাপনের সভা। সাহেবকে সভাপতি করা হইয়াছে।

ছায়ীদ বক্তৃতা দিতে যাইয়া সিরাজ মিঞার দানের কথা উল্লেখ করায় সভামধ্যে হাততালী ও মারহাবা রব হইতে লাগিল। জমিদার বাবুর দানের মাহাত্ম্যও কৃতজ্ঞতা

সহকারে স্বীকৃত হইল! সাহেবের উপলক্ষ, উদ্যোগ ও আয়োজনেই যে এত বড় একটা প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি স্থাপিত হইল, ইহাও সকলে উচ্চৈঃস্বরেই স্বীকার করিয়া ধন্য হইল।

সাহেব বক্তৃতা দিতে উঠিলেন,—বলিলেন,—এই মহা অনুষ্ঠানে তাঁহার কৃতিত্ব যে কতটুকু তাহা বুঝিয়া তিনি নিজে লজ্জিত। তবে তাঁহার আন্তরিক সহানুভূতি যে এতে আছে তাহা আর বলিবার প্রয়োজন নাই। পাড়াগাঁয়ে যে শ্রমবিমুখতার চেয়ে অতিশ্রমই রোগ শোকের কারণ তাহা এখন আর তাঁহার বুঝিবার বাকী নাই। যাঁহারা অত বড় বড় দান করিয়া এই অনুষ্ঠান সম্ভবপর করিয়াছেন তাঁহাদের নিকট দেশ ও দশ—সকলেই চিরকৃতজ্ঞ থাকিবে তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই।

পরিশেষে তিনি ঘোষণা করিয়া দিলেন, তিনি এবারকার পুরী যাওয়ার বন্দোবস্ত রহিত করিয়া তাহার খরচ বাবদ যে ৭০০৲ টাকা পৃথক করিয়া রাখিয়াছিলেন তাহা এই শুভ কাজে দান করিলেন। তাঁহার এই যৎসামান্য দানে যদি গ্রামবাসীদের কিছুমাত্র উপকার হয় তাহা হইলে তিনি নিজেকে ধন্য মনে করিবেন।

সভামধ্যে টী টী পড়িয়া গেল। "মারহাবা, মারহাবা," রবে মেদিনী কম্পিত হইল। সকলে বলিল, "খোদা, সাহেবকে

দুনিয়ার মালিক করুন, আর আমাদের জীর্ণ গ্রামটী স্বর্ণপুরী হউক।"

১৪

বাড়ীতে আসিয়া স্ত্রীর মুখের ভাবটী দেখিয়া সাহেব প্রমাদ গণিলেন, বলিলেন, "কি হয়েছে? মুখটী এত ভার যে?"—স্ত্রী রাগে গর্ গর্ করিতে করিতে বলিলেন, "হয়েছে, আর উপহাস করতে হ'বে না। আগে আমায় না ব'লে একটী চাতুরী করা হ'ল আর কি? যাক তুমি তোমার স্বর্গপুরীতে থাক আর পাড়ার লোকের চৌদ্দপুরুষের সাধ মিটাও,—তুমি আমায় বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দাও। টাকা দিতে চাও না ত আমার গয়না রেখে যাবার খরচের যোগাড় করে দাও। ছিঃ ছিঃ এত চতুরতা!"

সাহেব বলিলেন, "আচ্ছা, তাই হ'বে। কাল ভোরে তোমার গয়না গুলো দিয়ে দিও।" —আজ সাহেবের মুখ মলিন হইবার নহে। তিনি যে একটী বিরাট কিছু করিয়া ফেলিতে সাহস করিয়াছেন—তাহাতে তাঁহার অন্তঃকরণে আনন্দের সীমা নাই। তিনি সরিয়া পড়িলেন।

রাত্রিতে একত্রবাসের পরও যখন দেখা গেল, মেমসাহেবের মুখের ভার কমে নাই, তখন বোঝা গেল কলহ মিটে নাই। মেমসাহেব বাপের বাড়ী যাইবার যে গোঁ ধরিয়াছেন তাহা কার্য্যে পরিণত না করাইয়া আর নিরস্ত হইবেন না।

মেমসাহেব চুপ করিয়া মলিন মুখে বসিয়া বসিয়া কি আকাশ পাতাল ভাবিতেছেন এমন সময় তাহার আজন্ম দাসী হাবুর মা কি যেন বলিতে বলিতে আসিয়া সামনে থামিয়া গেল, বলিল, "হ্যা মা, কাল এত রাত্তিরে বাড়ী ফিরলাম, কৈ ডেকে ধমক দিলেন না! আমি কিন্তু ভারী ডরাইয়া গেছিলাম, হ্যা মা, আপনার মুখ এত ভারী কেন! হ্যা তাত হ'বেই; এখান থেকে কি যাবার ইচ্ছা ক'রছে? কাল বৈকেলে গাঁয়ে বেরলাম, যাবার আগে সবাইর কাছে বিদায় নিয়ে আসতে—তা দেখি মা, পাড়া শুদ্ধ মেয়ে লোক কাঁদা কাটি ক'রছে। কেউ খাওয়া দাওয়া বন্ধ করেছে, কেউ ব'লে সাহেবেরা এত অল্প দিনের জন্য বাড়ী না এলেও পারতেন, এখন শুধু মায়া বাঁধাইয়া দিয়া চলে যাচ্ছেন। মা আপনার ত তারা কেনা হ'য়ে গেছে। বলে, এমনটি আর গাঁয়ে পাড়া দেয় নি, যেন বেহেশ্‌তের সাক্ষাৎ হুরী, চেহারা যেন কাঁচা সোণা, মন কত বড়? তাঁর কাছ থেকে কেহ কিছু চেয়ে খালি হাতে ফেরে নাই। তারা বলে আর নাকি আপনাকে দেখতে পাবে না,—পাড়া গাঁয়ের কষ্ট কি আপনার সয়! হ্যা মা, আমি বাড়ী ফিরতে ফিরতে কেবল কাঁদলাম আর তাদের শোক দেখে রাত্তিরে ঘুমুতে পারলাম না।—আর জান, মা? ভুলুর মা বললে তুমি নাকি তাকে কথা দিয়েছ তার বাড়ী যাবে—সত্যি? বুড়ী কী খুশী! বলে, তুমি তাদের কত বড় দরদী......"

হাবুর মা এক নিঃশ্বাসে এতটুকু বলিয়া, দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে লাগিল। মেমসাহেবের চোখে জল আসিল, ভাবিলেন এরা মানুষ? না স্বর্গরাজ্যের অপূর্ব্ব জীব; বলিলেন, "যা হাবুর মা, ব'লে দিয়ে আয়, আমরা ত কাল যাচ্ছি না। ছুটীর সব কয়টা দিন বাড়ীতেই কাটাইয়া যাবেন বলিয়া সাহেব ঠিক ক'রেছেন।"

হাবুর মা—"তা হলে ত' তারা চাঁদ হাতে পাবে" বলিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া খবর দিতে গেল।

সাহেব আসিয়া খবর দিলেন, "নাও এই চিঠি লিখে দিলুম, ব্যাঙ্ক থেকে কিছু টাকা পাঠাতে; তুমি যখন বাপের বাড়ী যাবেই, তবে যাও। আমিও আমার বাপের বাড়ী কয়েকটা দিন কাটিয়ে যাই।"

স্ত্রী ছল ছল্ চোখে নিবেদন করিলেন—"তুমি আমায় ক্ষমা কর; আমিও কোথাও যাব না, এখানেই ছুটী কাটাব। আর আমার একটী কথা রাখবে? বল ত বলি। তুমি এখানে বছর বছর ছুটি নিয়ে আমাকে বেড়াতে নিয়ে আসবে? আমার গায়ের বোনদের যে আমি না দেখে কিছুতেই থাকতে পারবো না! ওগো, তারা যে আমাদের যাওয়ার কথা শুনে কেঁদে কেটে মরছে। তারা যে আমাদের খাঁটী দরদী। পুরী, সিমলায়, এখন হাজার হাওয়া খেয়েও ত আমার মন মানবে না।"

সাহেব ভাবিলেন, উভয়ের সুমতি হইল। বলিলেন, "আচ্ছা তাই হ'বে। চল মা'কে বলা যাক। তিনিও যে তোমার জন্য না খেয়ে রয়েছেন।"

উভয়ে হাত ধরাধরি করিয়া মা'র সম্মুখে দাঁড়াইলেন। মা'র আঁখি পাতে শুধু কাতরতা, তাঁর প্রাণে এক দারুন ব্যাকুলতা, উর্দ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া কি যেন ভাবিতেছেন। হঠাৎ দু'জনকে একত্র সম্মুখে দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, "তা বাবা তুমিও ওর সাথে যাওনা কেন, এখানে ক'দিন র'লে, এখন শ্বশুর বাড়ী কয়েক দিন বেড়িয়ে এস। আমার কথা রেখেছ তাতেই আমি খুশী।

মেম সাহেব আবার সলজ্জ বদনে হাত জোড় করিয়া কাতর কণ্ঠে নিবেদন করিলেন, "হ্যা মা, আপনি নাকি আমার জন্য খাওয়া দাওয়া ছেড়েছেন? আমি ভুল করেছি, আমায় ক্ষমা করুন। আমি কোথাও যাব না। এখানেই আপনাদের সঙ্গে বেড়াব।"

সাহেব বলিলেন, "খোদা আমাদের সুমতি দিয়েছেন। আমরা বছর বছরই ছুটী নিয়ে এখানে বেড়াতে আসব ঠিক করেছি। মা, আমাদের সাধের পৈতৃক বাড়ীটা পাকা করলে হয় না?" মা আর শুনিতে পারিলেন না। আনন্দে তাঁর চোখ থেকে ফোটা ফোটা জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। তিনি সোৎসাহে উভয়কে আশীর্ব্বাদ করিলেন,—"বাবা আমার, মা আমার, সারা

জীবনে এত সুখ তোরা আমায় দিস্‌নি। খোদা তোদেরে দুনিয়ার মালিক করুন, আর সোণার ইটে এই কাঁচা ভিটিতে দালান উঠুক। আমার শুধু আপত্তি রইলো একপাশে এতটুকু কাঁচা মাটির।"

———

কবির প্রেম *

(বড় গল্প)

১

বীরভূমের অধিবাসী হইলেও তাঁহার বীরত্বের আপদ ছিল না। কৈফিয়ৎ দিয়া বেড়াইতেন, বীরত্ব পূর্ব্বযুগের অতি আদরের সদ্‌গুণ হইলেও, বর্ত্তমান কারুণ্য ও প্রেমের যুগ! তাঁহার সঠিক নাম যে কি ছিল বলা দুঃসাধ্য। ছোটকালে পি. এম্‌. বাগচীর পঞ্জিকা দেখিয়া 'ইন্দ্রজাল' আনাইয়া মন্ত্র, তন্ত্র, ভোজবাজী আয়ত্ত করিতেন বলিয়া লোকে তাঁহাকে 'ইন্দ্রনাথ' বলিয়া ডাকিত। কিছুকাল পরে তাঁহার হঠাৎ পরিবর্ত্তনে, হিন্দুধর্ম্মের প্রতি তাঁহার অভক্তি, পণ্ডিতদের প্রতি তাঁহার কটূক্তি এবং শাস্ত্র পুরাণের প্রতি অবজ্ঞার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাইয়া সবাই তাঁহার নাম রাখিল, 'ভূতনাথ।' পরে দেখা গেল তিনি স্বীয় নাম সংস্কার করিয়া রাখিয়াছেন, প্রেমেন-রনাথ। হোষ্টেলে সিঙ্গল-সিটেড্‌ কামরা থাকিতেও কেন যে তিনি এগার নম্বর কামরাটীতে জাঁকিয়া বসিলেন এবং কামরাটী রিজার্ভ না করা সত্বেও কেন যে অন্য ছেলেরা কামরাটীতে টিকিয়া থাকিত না, তাহা সাধারণের পক্ষে বলা মুশ্‌কিল।

---

* বুলবুল—১৩৪৪।

অনেকে হয়ত অনেক কথা অনুমান করিয়া লইবেন। কিন্তু সমস্যাগুলির এক কথায় সমাধান করিতে হইলে বলিতে হইবে বন্ধুবর একজন কবি। তাঁহার পিতা মুন্সিফ ছিলেন। বহু টাকা পয়সা রাখিয়া যাওয়ায় বন্ধুবরের সংসার সম্বন্ধে দুশ্চিন্তা করার মত প্রয়োজন হয় নাই। তাই মস্তিষ্কের একমাত্র সদ্ব্যবহার করিবার নিমিত্ত তিনি শিশুকাল হইতে কবিতা রচনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। কবি শুধু প্রেম নিয়া খেলা করে, তাই বরিশালের ছেলেরা যখন আত্মকলহ করিয়া বারান্দার রেলীং লইয়া টানাটানি করিত, তখন কবিবর কামরার দরজা বন্ধ করিয়া নিতান্ত একেলাটী বসিয়া প্রেমের মদিরা পান করিতেন এবং ভাবী "পিয়া"কে পান করাইতেন। তাই বীরত্বহীনতার অপবাদ ততটা না খাটিলেও দুষ্ট ছেলেরা ঘাড়ে চাপাইয়া বসিত আর তিনিও সৌজন্যের আতিশয্যে স্বীকার করিয়া লইয়া ঠোঁট উল্টাইয়া জবাব দিতেন,—ওহে এ যুগ যে প্রেমের যুগ!

নামকরণের কারণ বিশ্লেষণ করিলেও বলিতে হইবে এই কবিত্বই তাঁহার সংস্কৃত নামের জন্য দায়ী। তাঁহার পূর্ব্ব-পুরুষেদর মধ্যে ফারসী শিক্ষিত বহু পণ্ডিত ছিলেন এবং সেই হেতু 'গজল' গানের দিকে তাঁহার বিশেষ ঝোঁক ছিল। প্রেমেন্দ্রনাথ লিখিতে বা বলিতে নাকি ছন্দ পতন হয়। তাই তাঁর নাম,—প্রেমেন্-রনাথ।

হোষ্টেলের সিঙ্গেল-সিটেড কামরাগুলো কবিতা লেখার খুবই উপযোগী হইলেও প্রধান অন্তরায় হইত দোসরের অভাব। এই কামরায় কেহ না কেহ সঙ্গে বাস করিবেই, তাই তিনি আশা করিতেন, কবিতা পড়িয়া পড়িয়া শুনাইয়া, তাহাদের বাহবা প্রাপ্তি হাততালি ইত্যাদি অঙ্গভঙ্গী দর্শন, গুণগান শ্রবণ, সকলই সহজ হইবে।

২

কিন্তু কেন যে হইল না তাহাই বলিতেছি। প্রথম কয়েকদিন কামরায় বেশ জমায়েৎও হইল, জল্‌সাও জমিল। একদিন হঠাৎ দুর্ভাগ্যবশতঃ নিজে ভাল করিয়া মজিবার ও অপরকে মজাইবার বিপুল আয়োজন করিলেন। কয়েকটী দুরন্ত ও রসজ্ঞ ছেলেও জড় হইল। সিগার সিগারেটের ধুমোদ্গীরণ উপরের ইলেকট্রীক লাইটটাকেও নিষ্প্রভ করিয়া দিল। জল্‌সা বসিলে কবিবর গম্ভীরভাবে হাত নাড়িয়া চাড়িয়া হেলিয়া দুলিয়া একটী সারগর্ভ বক্তৃতা ঝাড়িলেন। বলিলেন,—আমার রচিত কবিতা আপনাদেরে পড়িয়া শুনাইবার পূর্ব্বে কাব্য ও কবিতা সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলিয়া লইতে চাই। আশা, আপনাদের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিবে না। আপনারা সবাই জানেন, বাক্য প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত—গদ্য ও পদ্য। যাহা ছন্দোবদ্ধ নহে, তাহাকে গদ্য

বলে, যথা :—'কবিতা পড়িবার কালে সকলে চুপ করিয়া থাকিবে।' ছন্দোবন্ধ বাক্যকে পদ্য বলে, যথা :—

"পরের অভাব যদি কর নিরীক্ষণ,
আপন অভাব ক্ষোভ রহে কতক্ষণ ?"

সকলেই গম্ভীরমুখে মাথা নাড়িয়া সায় দিল। অজিতের সিগারেটটা পড়িয়া গেলেও সভার গাম্ভীর্য্য ভাঙ্গিবার ভয়ে আর সে তাহা উঠাইয়া লইল না।

কবিবর সোৎসাহে বলিয়া গেলেন—বাংলায় কবিতা রচনার কোন সুস্থির প্রকরণ নাই। কবিরা যথেচ্ছমত ছন্দের আবিষ্কার করিয়া লন্। একেবারে ছন্দ না হইলেও এবং কবি উচুদরের হইলে কিছু আসিয়া যায় না। পুরাতন সেই একাবলী তোটক, পয়ার ইত্যাদির আর এখন বড় একটা প্রচলন নাই। ফারসী, আরবী হইতে গৃহীত "গজল' এখন বাংলার চক্ষু সজল করিয়া তুলিয়াছে। "পিয়া"র নরম হাতের গরম মদিরা পান করিয়া এখন বাংলা দেশ উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে। আরবী, ফারসীতে বহু পূর্ব্ব হইতেই ছন্দ প্রকরণের সুদৃঢ় প্রচলন রহিয়াছে। আমি বহু পরিশ্রম করিয়া তথ্যগুলি আয়ত্ত করিয়াছি। 'ফ´া আ´লা´' শব্দটাকে বিভিন্ন প্রকারে নাড়া চাড়া করিয়া তাঁহারা নানারূপ মিত্রাক্ষর ছন্দ প্রস্তুত করিয়া থাকেন; যথা:—

মাফ´। ঈ´লন´। মাফ´। ঈ´লন´। মাফ´। ঈ´লন´।
মাফ´। ঈ´লন´। মাফ´। ঈ´লন´। মাফ´। ঈ´লন´।

—এই ছন্দের কোন ব্যতিক্রম করা চলিবে না। ধরুন বাংলায় এই ছন্দে কবিতা রচনা করিতে হইলে······

দুই একজন গা নাড়া দিয়া উঠিয়া মুখ টিপিতেছিল দেখিয়া কবিবর গম্ভীর মুখে আদেশ করিলেন—সাবধান! কেহ হাসিয়া ফেলিবেন না, আমি মাত্র একটী উদাহরণ দিতেছি—ধরুন, বলিতে হইবে,—

খাচার´ ভি´তর´। পাখী´ রে´ তোর´। কেমন´ লা´গে।
প্রেমেন্ র´নাথ´। পারে´ কই´তে´। সবার্ আ´গে´।

কবিবরের পূর্ব্বাদেশ এখন আর কার্য্যকরী রহিল না। সকলে হো হো করিয়া হাসির তুফান উঠাইয়া দিল! কবির সকল অনুনয় বিনয়েও আর তাহা পড়িল না। এবার তিনি বক্তৃতার সাধু ভাষা ছাড়িয়া তিরস্কারের অসাধু প্রয়োগ করিতে যাইয়া বলিলেন,—ছিঃ ছিঃ আপনারা ভদ্রলোকের সন্তান নন? বার বার বলছি—থামুন। কি? তোমরা থাম্‌বেই না? দেখ, আবার বলছি। বেরোও আমার ঘর থেকে, তোমরা কবিতা না ·····শুনবে। এখানে তিনি এমন একটী বাক্য প্রয়োগ করিয়া বসিলেন, যাহার বহুল প্রচলন থাকিলেও কাগজ-পত্রে উল্লেখ করা চলে না।

মিনিট দশেক হাসিয়া সকলে থামিল বটে, কিন্তু কবিবরের কৈফিয়ৎ চাহিবার ত্রুটী কেহই করিল না। একেই ত তিনি চটিয়া ছিলেন, তাহার উপর আবার কৈফিয়ৎ? তিনি সরোষে

কহিলেন,—হয়েছে—কৈফিয়ৎ না···ই দিব। এবার প্রকৃতই শান্তি-ভঙ্গের কারণ উপস্থিত; সকলের হাত গুটান দেখিতেই কবির রাগ পড়িল, বলিল, "যান আপনারা। ছিঃ অমন কর'তে আছে? আজ আর নয়, অন্য দিন আবার জল্‌সা করা যাবে।"

৩

ইহার পরে হোষ্টেলের ছেলেরা আর এদিক মাড়াইত না। কয়েকদিন কবিবরের ভারী কষ্ট হইল। কারণ, ভূরি ভূরি কবিতা কাগজেই রহিয়া গেল। শ্রোতার একেবারে অভাব!

অবশেষে ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি এক নূতন পথ বাহির করিলেন। নূতন কেহ ভর্ত্তি হইলেই তিনি যাইয়া আলাপ করিয়া বসিতেন এবং "সন্ধ্যার সময় আমার ওখানে নিমন্ত্রণ রইল" বলিয়া অভ্যর্থনা করিয়া যাইতেন। সদালাপে তুষ্ট নবাগত বোর্ডার মেসে খাবার বন্ধ করিয়া দিয়া আসিয়া এগার নম্বর কামরায় পা দিতেই দেখিত—অতিথিসেবার যে বিপুল আয়োজন রহিয়াছে তাহা কাগজের স্তূপেই সীমাবদ্ধ; ডিস্ প্লেটের চিহ্নমাত্র কোনখানে নাই।

সে বসিলে ছোট্ট একটি ভূমিকার পর—কবিতা পাঠের পালা শুরু হইত। সদ্য পরিচিত অতিথি ইচ্ছায় হউক আর অনিচ্ছায় হউক, "বেশ, খুব ভাল হয়েছে" ইত্যাদি মন্তব্য প্রকাশ না করিয়া পারিত না, আর

কবিবরেরও উৎসাহের সীমা রহিত না। ঘণ্টা দু' এক পুরাদমে চালাইলে শ্রোতা যখন বলিত, "আচ্ছা, এখন কিছু খেয়ে নেয়া যাক্ ; যা' হয় কিছু আনতে থাকুক," তখন কবি চোখ উল্টাইয়া বিস্ময় প্রকাশ করিতেন—সে কি গো! আমার এখানে যে শুধ্ খেয়ালী পোলাও পাকে! Man does not live by bread alone! অপ্রস্তুত অতিথি তখন "হা-ঠিক বটে! আমারই ভুল, তবে মেস্ থেকে দেখি কিছু খেয়ে আসা যায় কি না, তারপর না হয় আবার বসা যাবে"—বলিয়া বিদায় লইত।

কামরার বাহিরে আসিলেই অন্য সবাই তাহাকে ধরিয়া বলিত, কি হে ভায়া! নেমন্তন্ন খেলে কেমন? তা যাক আমরা সবাই কিন্তু এমনি করে খেয়েছি। তবে অপরের কাছে যেন এটা প্রকাশ না পায়—বেশ মজা দেখব।" বিজ্ঞাপন দেখিয়া ভিঃ পিঃ যোগে উড়োস্‌মারা কল আনাইয়া ঠকিয়া গিয়া যেমন কেহ অপরের কাছে নিজের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেয় না, সেও তেমনই এ কথা আর মুখে আনিত না।

কয়েকদিন পরে হোষ্টেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বাবু কবিবরকে অনুযোগ করিয়া বলিলেন—কি হে? তুমি এ কামরাটা রিজার্ভ করে নাও না কেন?—তোমায় ত আর অম্‌নি এটা ছেড়ে দিতে পারিনে। না হয়, তুমি অন্য কামরায় ঢুকে পড়। তিনি উত্তর করিলেন,—আমিই কি বলছি, স্যার, এটা আমি

একা ভোগদখল করব? আপনিই না হয় ছেলে জুটিয়ে দিন না কেন। আমি ত চাই-ই তাই।

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এখনই ভাল বুঝিতে পারিলেন না; পরে অপরের কাছে কবির এই দুরারোগ্য রোগের কথা শুনিয়া খুব হাসিলেন।

৪

'লেখাপড়া করে যে—গাড়ী ঘোড়া হাঁকে সে'—

গোছের বিশুদ্ধ ভেজাল-ঘৃতবৎ কত কবিতাই তাঁহার বাক্সে রহিয়া গিয়াছিল। সযত্নে রক্ষিত ঘৃত যত পুরাতন হয় ততই তাহার উপকারিতা যেমন বাড়ে, এগুলিরও এক সময়ে সমাদর হইবে বলিয়া প্রেমেন্দ্রেরও বিশ্বাস ছিল। এ সমস্ত ছিল তাঁহার স্কুল-জীবনের সাময়িক কস্‌রতের ফল। মফঃস্বলে থাকিবার কালে, সম্পাদকদের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পান নাই, সেজন্যই নাকি এগুলি ছাপার অক্ষরে দেখা দেয় নাই। কবিবর এখনও পুরাতন বাক্স খুলিয়া সেগুলি মাঝে মাঝে আওড়াইয়া সুখী হইতেন এবং বলিতেন—ওহে! A Poet is born, not made! তিনি যাহাই বলুন না কেন, রক্ষা, কবিতা লেখার আসল ঝোঁকটা চাপিল তাঁহার এণ্ট্রান্স পাশ করিবার পর—তাহা না হইলে কলেজে তাঁহার চরণার্পণ হইত কি না সন্দেহ।

কলিকাতায় আসিয়া সম্পাদকদেরে এদিক ওদিক নিজ ব্যয়ে বহন করিয়া বেশ হাত করিলেন। সাময়িক পত্রিকায়

তাই মাঝে মাঝে তাঁহার কবিতা দেখা দিতে লাগিল। যে মাসের পত্রিকায় তাঁহার কবিতা দেখা দিত সেই মাসের বস্তাখানেক কাগজ কিনিয়া আনিয়া তিনি বন্ধু মহলে বিনা পয়সায় বিতরণ করিতেন। কবিতা পড়িয়া না হউক, অন্ততঃ বিনা পয়সায় কাগজগুলো পাইয়া সকলে তাঁহাকে ধন্যবাদ দিত আর তিনি মনে করিতেন—তাঁহার কবিত্বেরই সবাই প্রশংসা করিল।

সে বৎসর কবিবর এফ্. এ, পরীক্ষায় ফেল ত করিলেনই যাহাকে মিজারেবল্ ফেল্ বলে, তাহাও করিয়া বসিলেন। বাংলা পেপারে রাশি রাশি কাগজ অমিত্রাক্ষর ছন্দে অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা করিয়া উড়াইয়া দিলেন। তাহাতে আর কিছু না হউক বাংলার প্রফেসারের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ আলাপ হইয়া গেল। পণ্ডিত মহাশয় তাঁহাকে ডাকাইয়া সহাস্যে বলিলেন,—কি হে? কবি হবার সাধ বুঝি! বেশ, তা হলে আগে সোজা সোজা পয়ার, ত্রিপদি লিখ, শেষে না হয় অমিত্রাক্ষর ছন্দে হাত দিও। তিনি—সে কি? আপনি তা হ'লে আমার কবিতা দেখেন নি? গজলে' ত আমার হাত পেকেই গেছে—বলিয়া অদ্ভুত, বুদ্বুদ প্রভৃতি অখ্যাত, কুখ্যাত কয়েকটি মাসিক পত্রিকার নাম করিয়া ফেলিলেন। শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন,—তা বেশ, তা হ'লে তুমি আমাদের কলেজ ম্যাগাজীনেও কিছু কিছু লিখ, বুঝলে?

প্রেমেন্দ্র বুঝিল। তাঁহার আর স্ফূর্ত্তির সীমা রহিল না। তিনি সোৎসাহে বলিয়া গেলেন—আজ্ঞে, নিশ্চয়, নিশ্চয়। আমি কালই আমার রচনা কতগুলো দিয়ে যাব। আর ঐ পত্রিকাগুলো? পড়বার জন্য পাঠিয়ে দেব?

পণ্ডিত মহাশয় শূন্য ওয়েষ্ট-পেপার বাস্কেটটার দিকে খানিক তাকাইয়া ভাবিলেন—আমরা ত আর দারোগাগিরী করি না? উপোরি পাবার মধ্যে যা কিছু ওই একজামীনের কাগজগুলো,—মুদিকে দিয়ে দু'চার পয়সা পান-তামাকের দামটা হবে বৈকি?—প্রকাশ্যে বলিলেন,—হ্যা বাপু, বেশ, যত কপি পার পাঠিয়ে দিও' খন। কবিবর সেদিন এত আনন্দ লইয়া হোষ্টেলে ফিরিলেন যে পরীক্ষায় ডবল্ পাশ্ করিয়া ফেলিলেও তাহা হইত না!

এই আকস্মিক পরিচয় আবার তাঁহাকে আপাততঃ এক সমস্যা হইতেও বাঁচাইয়া দিল। কয়েকদিন পরে কবিবরের নামে প্রিন্সিপালের অফিস হইতে যে পত্র আসিল তাহাতে তিনি ফেল করিয়া উল্টোদিকে ফার্ষ্ট হইয়া গিয়াছেন, এবং কলেজের সমস্ত পূর্ব্ব রেকর্ড ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছেন, এই হেতু তিনি এই কলেজ হইতে অন্যত্র গিয়া কেন নাম জাঁকাইবেন না তাহার সন্তোষজনক কারণ দর্শাইবার কথা ছিল। শাস্ত্রী মহাশয় সকল শুনিয়া হাসিয়া বলিলেন,—ওহে তুমি ভেবনা। চলো, তোমাকে নিয়ে না হয় সাহেবের সঙ্গে

দেখাই করে আসি। প্রেমেন্দ্রনাথ কবি হইবার চেষ্টা করিতেছেন এবং আংশিকভাবে হইয়াও গিয়াছেন ; আগামী বৎসর তিনি তাঁহাকে কলেজ ম্যাগাজীনের বাংলা সেক্‌শ্‌নের সাব্‌ডিপুটী এডিটর করিবেন বলিয়া একরকম ঠিকই করিয়া ফেলিয়াছেন ইত্যাদি কথা সাহেবকে বুঝাইয়া দিলে সাহেব কবিবরকে ভর্ৎসনার বদলে অভিনন্দন করিলেন এবং সবটুকু ইংরাজিতে বলিয়া কবির ভাষায় উপসংহার করিলেন,—টা হ'লে টুমি সাড়া জীবন এই বিড্যাগাড়ে ঠাকলেও আমার কোন আপট্টি নেই।

৫

আম পাকে, জাম পাকে, এমন কি বেল ফলের মত এমন শক্ত জিনিষটাও যেমন পাকিয়া যায়, তেমনি প্রেমেনের হাতও পাকিয়া গেল। প্রেমেন কচু গাছ কাটিতে কাটিতে শেষে সত্যই ডাকাত হইয়া উঠিলেন। এখন তিনি শুধু পত্রিকায় ছাপার অক্ষরেই দেখা দেন তা নয়, মাঝে মাঝে অজ্ঞাত সমালোচকেরা তাঁহার ছন্দ, ভাব, ভাষা ও ভঙ্গী লইয়া আলোচনা পর্য্যন্ত করিয়া থাকেন। এতদিনে প্রেমেনের 'চির-অবনত অন্য সবাইর শির' গোছের অনেক কথাই মনে হইতে লাগিল। কবি রাজসম্মানে সম্মানিত হইয়াছেন, এমন কি কেহ কেহ 'অবতার' হইবার দাবী পর্য্যন্ত করিয়াছেন।—বন্ধুবরের ভাগ্যে এমন কিছু এখনো হয় নাই!

সেবার 'অনাগত' পত্রিকায় একটী গজল বাহির করিলেন এবং তাহার শেষ কাব্যোচিত ভাবেই করিলেন—

শুধু কবি মোরে ব'লো না'কো ব'লো শিরাজী,
হাফিযের প্রতিদ্বন্দী ভবে বিরাজি।

বলা বাহুল্য কবিবরের হিন্দু-মুসলিম প্রীতির মত কোন অনাবশ্যক উদ্দেশ্য ছিল না, ছিল বিশ্ববিখ্যাত পারস্যের অমর-কবি হাফিযের প্রতিদ্বন্দিতা। তাই তাঁহার ধৃষ্টতায় অনেকেই সন্তুষ্ট হইতে পারিল না। ছ্যাঁচড়া কাগজগুলো খোঁচাইয়া খোঁচাইয়া তাঁহাকে প্রাণান্ত করিবার যোগাড় করিল।

কবিবরের রাগের সীমা রহিল না। উহার ন্যায়সঙ্গত কারণ—বাংলার সমাজ তাঁহার এই অতি ন্যায্য দাবীটার এতটুকুও সম্মান করিল না। এ সমাজ আর যাই করুক, কবির উপযুক্ত সম্মান যে করিতে শিখে নাই এ বিষয়ে তাঁহার ফোঁটামাত্র সন্দেহ রহিল না এবং এই সমাজের ভবিষ্যৎ অমঙ্গল-চিন্তা তাঁহাকে বারে বারে পীড়া দিতে লাগিল।

ছোট্ট সরোষ একটি প্রতিবাদপত্রে কবিবর ঘোষণা করিলেন,—আর যাই হ'ক, সিরাজগঞ্জে তাঁহার বাবা চাকুরী দশায় বাড়ী কিনিয়াছিলেন সেই সূত্রেও তো তিনি নিজেকে সিরাজগঞ্জী তথা সিরাজী বলিয়া প্রকাশ করিতে

পারেন। এতটুকু অস্বীকার করার মত সঙ্কীর্ণতা তিনি আশঙ্কা করিতে পারেন নাই। কাহারও বিশ্বাস না হইলে তিনি মিউনিসিপ্যালিটীর ট্যাক্সের রশিদ পর্য্যন্ত দেখাইতে পারেন!

এত বড় সন্তোষজনক কমিউনিকে প্রচার করা সত্ত্বেও কবিবরের উপাধিটা টিকিল না এবং লেজটী খসিয়াই যাইতেছে দেখিয়া ইহাকে তিনি স্বেচ্ছায়, সজ্ঞানে, অন্যের বিনা অনুরোধে ইস্তফা দিলেন।

৬

কবিবরের আকৃতির বর্ণনা না করিয়াই "পরিচয় পর্ব্ব" শেষ করিতে চাহিয়াছিলাম। কারণ--আকৃতির জন্য সাধারণতঃ বিশ্বস্রষ্টাই দায়ী। উহা লইয়া সমালোচনা করাটা স্রষ্টার কারুকার্য্যেরই দোষগুণ দেখান বৈ আর কি? কিন্তু আকৃতির যেটুকু প্রকৃতিগত তাহার সম্বন্ধে দু'একটী কথা বলা বোধ করি অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

বন্ধুবরের মাথাটি ছোট। ডাক্তারেরা কি বলিবেন জানি না, তবে আমাদের মনে হয়, কবিতা চিন্তা করিতে করিতে মস্তিষ্কের উপর আঘাত লাগায় মস্তকটী আর বাড়িতে পারে নাই। চক্ষু দুইটী নিমিলীত প্রায়! হঠাৎ দেখিলে, বুদ্ধদেবের প্রস্তর-মূর্ত্তি বলিয়া মনে হয়। ভাবমগ্ন কবিদের চক্ষু দুইটীর অবস্থা না কি এমনতরই হইয়া থাকে! গলদেশের উপরিভাগে আকৃতির প্রকৃতিগত বিকৃতি আর বড় একটা

দেখা যায় না, তবে নীচে নামিলেই সেই প্রকাণ্ড বক্ষ ও উদর দেখিয়া দুই পা পিছাইয়া যাইতে হয়, কারণ এদিক দিয়া অন্যায় ভাবে শরীরের অতি নিকটে আসিয়া পড়া হইয়াছে বলিয়া ভয় হয়। ডাক্তারেরা বলিতেন,—ব্যায়ামের অভাবেই হয়ত এমনটা হইয়াছে।

গজল, গান ইত্যাদিতে কবিবর অনাগতা পিয়ার বিচ্ছেদের উচ্ছেদ সাধন করিবার নিমিত্ত একমাস ধরিয়া অভিমানে অনশন করিয়া বসিয়া আছেন বলিয়া পুনঃ পুনঃ নোটীশ দিতে থাকিলেও প্রকৃতপক্ষে তিনি রুচিকর খাদ্যের সদ্ব্যবহারের বড়ই পক্ষপাতী ছিলেন। মেসের অখাদ্য খাদ্য আর তাঁহার ভোজনেন্দ্রিয় দিয়া বড় একটা প্রবেশ করিতে চাহিত না। তৎপরিবর্ত্তে ষ্টোভ জ্বালাইয়া—তাঁহার সকল সুখের আকর অতি বাধ্য চাকরটী নানারূপ পুষ্টিকর চর্ব্ব্য চোষ্য পাকাইয়া দিত। তাহার উপর নিউমার্কেট হইতে কেক্ বিস্কুট আনিবার বেদম ফরমায়েস পালন করিতে করিতে ভৃত্যবরের অপর কর্ত্তব্য—শরীর ডলাই-মলাই করাটা সময়ের অপেক্ষা অসময়েই চলিতে থাকিত!

৭

কস্য বিবাহ-প্রস্তাবনামা পত্র মিদং কার্য্যঞ্চাগে—অধুনালুপ্ত শিরাজী লেজ বিশিষ্ট—কবিবর-বরশ্রেষ্ঠ প্রেমেন ওরফে রনাথ, —মোকাম প্রেমনগর, জিলা বীরভূম, হাল সাকীন শহর

কলিকাতা, ব্যবসা কবিতার হালটী……আরম্ভ করিতেই—পার্শ্বোপবিষ্ট বন্ধু কলম চাপিয়া ধরিয়া চোখ দুটী আত্যন্ত বিস্ফারিত করিয়া চেঁচাইয়া উঠিলেন—আঃ কর কি ? কর কি ?

বিরক্তির স্বরে কহিলাম, আঃ বাধা দিও না—কেন হয়েছে কি ? বন্ধুবর অভিমানের সুরে কহিলেন,—বেশ তা' হলে লিখে যাও মাথা-মুণ্ডু যত ! বলি একেবারে বিবাহ-প্রস্তাব নিয়েই একটী পরিচ্ছেদ আরম্ভ করে দিলে যে ? একবার আজকাল যা সচরাচর হয়ে থাকে তার দিকে তাকিও।—এই ধর না ছেলে কলেজে পড়ে, হাতে গচ্ছিত ধন, কলমে বেজায় জোর—চাকুরী বাকুরী ত বড় একটা জুটেই যাবে। অভিভাবকেরা দর দস্তুর করে হতেই চালিয়ে থাকবেন। তা টাকা পয়সা জিনিষ পত্তরের বড় একটা অফার ঠফার হয়ে গেলেই, "বিবাহ সুস্থির, বাছা ঘরে এস," বলে আর্জেণ্ট তার ! রেল জাহাজে যাতায়াতে ধর কয়েক ঘণ্টা—তার পরেই ত বিবাহ, চোখো-চোখি, প্রণয় ইত্যাদি, ইত্যাদি। এতে করে বিবাহ বর্ণনাইত তিন চার লাইনের বেশী হওয়া উচিত নয়। আর পাঁচ ছয় লাইনে ত একেবারে ঘর সংসার পাতিয়ে, সন্তান-সন্ততি মায়—নাতি-পুতি পর্য্যন্ত জন্মিয়ে দেখান যায়, নয় ?

হাসিয়া বলিলাম—হ্যাঁ, তা ঠিক বটে কিন্তু—সাধারণ লোকের পক্ষে। এ যে কবি ! "ওঠ্ ছুঁড়ী তোর বিয়ে"—ওর

বেলায় খাটে না। একটু সবুরই কর না, দেখতে পাবে তাঁর বিয়ে দেওয়াটা কেমন নিটখুটে একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

বাস্তবিকই তাই। কবিবরের পিতার অবর্ত্তমানে অন্য সব সেকেণ্ড্ হ্যাণ্ড অভিভাবক তাঁহার মতামত না জানিয়া কোন কন্যাদায়গ্রস্ত ভদ্রলোককেই এতটুকু আশ্বাসও দিতে সাহস করেন নাই। কবিবরেরও তেমন আগ্রহ দেখা যায় নাই, তাই প্রসঙ্গটি যেন চাপাই পড়িয়া গিয়াছিল। উপর্য্যুপরি দুইবার এফ্, এ, পরীক্ষায় সম্মানের সহিত ফেল করিলেও তাহার কিছুমাত্র চিত্তবৈকল্য উপস্থিত হয় নাই। সকল বিষয়ে অকৃত্রিম উদাসীনতাই কবির ভূষণ।

প্রসঙ্গটি আরও বহুকাল চাপিয়াই থাকিত, কিন্তু হঠাৎ হোষ্টেলে মহাত্মা চিত্তরঞ্জন বাবুর আবির্ভাব হওয়ায় আর তাহা হইতে পারিল না। তিনি ছিলেন, "পরোপকারী অসীমবাবু।" হোষ্টেলের সাব্ এসিষ্ট্যাণ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হইলেও তিনি ছেলেদের সহিত মিলিয়া মিশিয়া আমোদ পাইতেন। শুধু তাহাই নহে, কাহার কি অভাব, কোথায় ব্যথা,—কিসের দুঃখ—সকল তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া বেড়াইতেন। কাহারও অর্থ-কষ্ট বা খরচের অকুলান হইয়াছে জানিতে পারিলেই তিনি দৌড়িয়া আসিয়া বাজেট্ ইন্সপেক্সন করিয়া বিড়ির পয়সা, ধোবার বিল, ট্রামের ভাড়া, ইত্যাদি রিট্রেঞ্চ এবং সন্ধ্যার পর গড়েরমাঠ হইতে ফিরিবার কালে

কয়েকটী বিশিষ্ট গলির মধ্য দিয়া আসা বন্ধ করিয়া দিয়া যাইতেন।

কবিবরের সহিত প্রথম আলাপেই তিনি তাঁহার অফুরন্ত কবিত্বরস ও জগতের সহিত অকৃত্রিম উদাসীনতার পরিচয় পাইলেন। ছেলেদের নিকট বাকী পরিচয়টুকু পাওয়ায় কবিবরের প্রতি তাঁহার সহানুভূতি আরও বাড়িয়া গেল। এ হেন কবির শত উদাসীনতা সত্ত্বেও যে বাংলার কন্যাকুলের পিতৃকুল তাঁহাকে টানিয়া লইয়া জামাতার আসন দেয় নাই, একথা ভাবিতেই গুণবন্ধু চিত্তরঞ্জনের শরীর কাঁটা দিয়া উঠিল। হায়, বাংলার সমাজ এখনও গুণের আদর করিতে শিখে নাই!

৮

একদিন বৈকাল বেলায় ছাত্রবন্ধু চিত্তরঞ্জন বাবু চুপে চুপে এগার নম্বর কামরায় ঢুকিয়া দেখিলেন কবিবরের নিমিলীত চক্ষু দুইটীর পাশ দিয়া দুই ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িতেছে। নিঃশব্দে একখানি চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া কহিলেন,—কি হে ভায়া!—"পিয়া" গাছের গোড়ায় জল্ সেচন হচ্ছে বুঝি? তা যেমন গরম পড়েছে তাতে ক'রে গাছটী না শুকিয়ে যায়, তা'তদেখ্‌তেই হবে। সন্ধ্যাবেলায় একটু বেড়ান-টেড়ান?

—না হয়নিক! যেতে পারিনি,—বলিয়া অতি বিশ্রী একটা অঙ্গভঙ্গি করিয়া কবিবর চোখ মেলিয়া চাহিলেন। সম্মুখে কে

উপবিষ্ট দেখিয়াই লজ্জায় মুখটি রাঙ্গা করিয়া জিহ্বা সিকি পরিমাণ বাহির করিয়া দাঁতে চাপিয়া ধরিয়া, কহিলেন,—স্যার! আপনি? মাফ করবেন। আমি মনে করেছি বুঝি হোষ্টেলের কোন ছেলে শুধু শুধু আমায় ঘাটাতে এসেছে—তা বসে বসে ভাবছিলুম, প্রেম সবাই করবে আর কবিকে করতে হবে তাঁদের মনের অবস্থা কল্পনা! আবার কল্পনা বাস্তবকেও অতিক্রম করে যায়, তাই কবিকে পরের বোঝা বইয়ে বেড়াতে হয়। বুঝলেন স্যার!

—হ্যা, ঠিক তাই বটে!

—আরে কে? পিওন? দিয়ে যাও চিঠিগুলো। এইত স্যার, 'অদ্ভূত' পত্রিকার কপি এসে পড়েছে—ভাবছিলুম সময়মত সব কথা মনে পড়ে না। এসংখ্যায় একটা 'রুবাই' ছাপবে বলে খবর পেয়েছি। সম্পাদক মশাইও 'বেশ হয়েছে' বলেছেন, কিন্তু শেষের পদটা এমন সুন্দরভাবে বদলানো যেত যে, ভাব অর্থ সকলই আরও চমৎকার হত। দেখবেন স্যার! রুবাইত নয়, একেবারে গোলকধাঁধাঁ! লোকে ওমর খৈয়াম, ওমর খৈয়াম করে চেঁচায়, বলি আসত দেখি ওমর খৈয়াম এ যুগে?

চিত্তরঞ্জন বাবু আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন,—রুবাইকে তাহলে বাংলায় কি বলবো?

এই ধরুন না কেন "চতুষ্পদ" কবিতা। এর মূল সৌন্দর্য্যই হচ্ছে গিয়ে—যে পড়ে পড়ে ভেবে ভেবে হয়রান হলেও তার

অর্থ সম্পূর্ণভাবে বোঝাই যায় না। যথা দেখুন না, এই কাগজ-টিতেই (পাতা উল্টাইয়া) একটি বেরিয়েছে :—

ছাত্রবন্ধু বিশেষ আগ্রহ না দেখাইয়া বাহিরের দিকে তাকাইয়া বলিলেন,—চতুষ্পদ অর্থে ত আমরা গরু, মহিষ, গাধা ইত্যাদিও বুঝি!

কবিবর সেদিকে মন না দিয়া পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে বলিলেন,—এইত শুনলেই বুঝতে পারবেন—এই পেয়েছি—আমি পড়ি শুনুন স্যার—

সাগর পাড়ে জন্ম আমার, নদীর ধারে বাস,
খালের পাড়ে কর্ম্ম আমার, খাই শুধু ঘাস,
পুকুর পাড়ে সন্ধ্যা বেলায়, করি আনা গোনা—

আঃ কি সর্ব্বনাশ! দেখছেন তামাশা? শেষের লাইনটি একেবারে বাদই পড়ে গেছে! ছিঃ সম্পাদকেরা কেমনতর; একটু দেখেও দিতে নেই? আর যদি বাস্তবিকই আমার পাণ্ডুলিপিতেই বাদ পড়ে গিয়ে থাকে, তা হলে কি আর স্মরণ করিয়ে চেয়ে নিতে নেই?

চিত্তরঞ্জনবাবু বাধা দিয়া কহিলেন—তাঁরা হয়ত মনে করেছেন এটা চতুষ্পদ নয়, ত্রিপদ। তা বেশ বিশেষ সৌন্দর্য্যহানি হয়নি ত!

—হ্যা, তাই হবে বলে মনে হয় স্যার। ঐ যা বলছিলুম,—দেখুন হঠাৎ এর অর্থ ধরতে পারবেন কি?

—হ্যা, বিষয়টা জটিলই বটে ? কিন্তু হঠাৎ ঐ যে তিনটি চতুষ্পদের নাম করলুম ওর মাঝের টা নয় কি ? কিন্তু আবার জন্মের দিকটা মিলছে না—

কবিবর হাসির তুফান উঠাইয়া দিয়া বলিলেন,—ঐ যে বলেছি—যাক—অর্থ ও তাৎপর্য্য বের করাটা হয়েছে টীকাকারদের কর্ত্তব্য ; কবিরা শুধু করেন রচনা !

কবিবরের হাসির ঢেউ মিলাইয়া গেলে, ছাত্রবন্ধু গম্ভীর ভাবে প্রস্তাব করিলেন—দেখুন—একটী কথার জন্য এসেছি —আপনার বে' থা' হয়েছে ? হয় নি বলেই ভেবেছি এবং কি করে হওয়ানো যায় চেষ্টা করব বলে মনে করেছি।

কবি এবার নিরুৎসাহে উত্তর করিলেন,—হ্যা, শুনেছি স্যার, আপনি পরের অভাব খুঁজে খুঁজে তার পূরণ করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়—কি সুখের বিষয় জানি না—আমার কোন অভাবও নেই, তাই অনুগ্রহেরও দরকার হবে না। আপনাকে বিশেষ ধন্যবাদ !—

—কিন্তু বিয়ে না করলে চলবে কেন ? বলছি, আপনার কোন কষ্টই হবে না—শুধু আপনার সম্মতি চাই।

—আচ্ছা স্যার, যদি কেন আর কিন্তুর মধ্যেই গেলেন, তবে বলুনত আমি যে বিয়ে করি নাই তার প্রমাণ ?

—একটী ? সে বহু আছে—ধরুন—

প্রথমতঃ—আপনি ছোট খাটো ছুটীতে আর বাড়ীর দিকে মুখ করেন না—

দ্বিতীয়তঃ—নিউমার্কেট থেকে কেক্ বিস্কুটের বহু প্যাকেট আসলেও ছেলেরা কেউ শাড়ীর পাড় বা সেমিজের কোণাটি পর্য্যন্ত দেখতে পায় না।

—তৃতীয়তঃ—আপনার শরীর অসংযতভাবে বিস্তৃতিলাভ করছে।

—চতুর্থতঃ—আপনার—বাধা দিয়া কবি কহিলেন,—আচ্ছা বেশ্, এখন বলুন বিয়ের পক্ষে কোন সুযুক্তি আছে?—

—একটী? সেও বহু—ধরুন।—

প্রথমতঃ আপনার বিশেষ আগ্রহ না থাকলেও আপনি বাংলার পিতৃকুলের একটী হতে দশ বিশটির পর্য্যন্ত মুখ উজ্জ্বল করতে পারেন।

দ্বিতীয়তঃ আপনার মস্তিষ্ক কবিত্বে নিযুক্ত থাকলেও, আপনার শরীরসেবার ভার একটি হতে দশ বিশটি মেয়ে হাতে নিয়ে ধন্য হতে পারে।

তৃতীয়তঃ—আপনার কবিত্ব শুধু আপনাতেই সীমাবদ্ধ থেকে যাবে কেন? আপনার পরিবারের রক্ত স্রোতের সঙ্গে অর্থাৎ সুদূর বংশধরগণের মধ্যে পর্য্যন্ত অসাধারণ কবি প্রতিভা প্রবাহিত হতে পারবে।

চতুর্থতঃ—আপনার শরীরের—

বাধা দিয়া কবি কহিলেন—বেশ, বুঝলুম সেও অনেক আছে তবে তৃতীয় দফার গুরুত্বই বেশী বলে মনে হয়।

কিন্তু আসলকথাটাই বলে ফেলি—আমার কবেই বিয়ে হয়ে গেছে স্যার।

—তা হলে আপনি তাঁকে দেখতে পারেন না? তিনি স্বামীসুখবঞ্চিতা?—

ছাত্রবন্ধুর উচ্ছ্বসিত প্রশ্নবেগে বাধা দিয়া কবি হাসিয়া বলিলেন—তাঁহার প্রতি আপনার উক্তি কোনটাই সত্য নয়—তিনি উপেক্ষিতা নন্ বরং দাম্পত্য সুখের চিহ্নবাহী বহু পুত্রকন্যাও আমাদের হয়েছে। তাদের মুখ দেখে সবাই তাকিয়ে থাকে!

আমায় অবাক করে দিলেন প্রেমেনবাবু—আমি কিছুই বুঝতে পাচ্ছিনে; আর তা হলে হোষ্টেলের ছেলেপেলেরাই বা কেন তা'দেরে দেখতে পাবে না?

—আরে ছাই—আমি কি বলছি তারা দেখ্তে পাবে না? আপনি নিজেই না হয় দেখে যান—বলিয়া রনাথ বাবু শরীরের গুরুভাব উত্তোলন করিয়া আলমারিটার সামনে দাঁড়াইয়া পুরাতন মাসিক পত্রিকার বাণ্ডিলগুলি হাতড়াইতে লাগিলেন। ছাত্রবন্ধুর তখনও বিস্ময় কমে নাই, তিনি অধীর হইয়া বলিলেন—ওগুলো আর এখন ঘাটবেন না—আমার সময় নেই—আপনার কথার তাৎপর্য্য না হয় টীকাকারদের কাছ থেকেই বুঝে নেব!—

কবি একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন—তা হলে আসল কথাই শুনে যান স্যার—কল্পনা দেবীর সঙ্গে আমার শুভ পরিণয় কবেই

হয়ে গেছে এবং কবিতাই আমাদের অপত্য। মাঝে মাঝে এসে ছেলেপিলেদেরে দেখে যাবেন—নেমন্তন্ন রইল। আমার বিয়ের জন্য কষ্ট করছেন, সে জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।—

৯

চিত্তরঞ্জন বাবুর চিত্তের প্রশস্ততা সত্ত্বেও, তখন আর কামরায় যাওয়া হইল না। তিনি মুখভার করিয়া বারান্দায় দুই চারি বার পায়চারী করিলেন এবং শেষে হঠাৎ কমনরুমের দিকে লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া ছুটিলেন। মাঝের চেয়ারখানিতে ধপাস্ করিয়া বসিয়া পড়িয়া—গম্ভীর মুখে হাঁকিলেন,— দারোয়ান, বাত্তি জ্বালাও। বাত্তি জ্বালিলে, ১নং আওর ২নং কাম্‌রেকা ‍দু লেড়কা লোককো বোলাও।—দারোয়ান হুকুম লইয়া উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল।

ছাত্রবন্ধু পরোপকার করিতে যাইয়া বহু কষ্ট সহ্য করিয়াছেন, এমন কি প্রাণপাত পর্য্যন্ত করিতে প্রস্তুত আছেন, কিন্তু শত কষ্টেও তাঁর রোষ বা ক্ষোভের সঞ্চার হয় নাই। আজ বাস্তবিকই তাঁর রাগ হইয়াছে এবং এটা বোধ করি মহাত্মার honest rage, অর্থাৎ ন্যায্য ক্রোধ যাকে বলে তাই! তিনি উপযাচক হইয়া এত বড় একটা উপকার করিতে গেলেন আর প্রেমেন তাঁর একেবারে নিঃস্বার্থ প্রস্তাবটীকে হাসিয়াই উড়াইয়া দিলেন!

ছেলেরা হল্লা করিয়া আসিতেছিল, চিত্তবাবুর মুখের ভাব

দেখিয়া চুপে চুপে পা টিপিয়া টিপিয়া কমনরুমে প্রবেশ করিল। অজিত বলিল,—স্যার, তা হ'লে এটাকে ইমার্জ্জেন্সী-মিটিং বলব ? আলোচনা সভয়ে না নির্ভয়ে করতে হবে ?

চিত্তরঞ্জনবাবু এবার কৃত্রিম হাসি হাসিয়া বলিলেন,—Don't be silly, Ajit ! আমি মতামতের উপর ট্যাক্স বসাইতে মোটেই রাজী নই। আমার প্রিন্সিপ্‌ল্ হচ্ছে, স্বাধীন আলোচনা।—ব্যাপারটা হ'ল—এই—পশু—I mean—পতি,—behave properly—মুখ ভেংচানো হচ্ছে বুঝি ? বিষয়টা এই—বলতে লজ্জা করে—এগার নম্বর কামরা আজ আমাকে অপমান করেছে—!

পশুপতি মুখটা আরও বিকৃত করিয়া অধীর ভাবে চেঁচাইয়া উঠিল,—স্যার,—শীঘশীর করে বলুন, কী ক'রে—ভীষণ প্রতিশোধ—বলিয়াই টেবিলে প্রচণ্ড চপেটাঘাৎ করিয়া—চাই ই—বলিয়া উপসংহার করিল।

অজিত প্রতিবাদ করিল—স্যার—পশুকে চুপ করিতে বলুন—আলোচনা উত্তেজনাবর্জ্জিত হওয়া উচিৎ। আগে ব্যাপারটা আমরা শুনে নিই, তার পরে প্রস্তাব করব।

তাই হউক ; তোমরা আগে শুনে নাও ব্যাপারটা··· ····· বিবাহপ্রস্তাব শুধু প্রত্যাখ্যানই নয় এমন কি রহস্য করিয়া উড়াইয়া দেওয়া ! ছাত্রবন্ধু উত্তেজনাবর্জ্জিত ভাষায় একটা বক্তৃতা দিয়া বসিয়া পড়িলে—'আমি প্রস্তাব করছি'—'আমি

প্রস্তাব করছি' বলিয়া সকলে বিষম গোলযোগ করিতে লাগিল।

—Order—order—আচ্ছা পশুপতিরই ব্যস্ততা বেশী, ওই বলুক। পশুপতি রাগে গরগর করিতে করিতে বলিল —আমার প্রস্তাব—ভীষণ প্রতিশোধ! সবাইর মত হলে আমি এক্ষুনি প্রস্তুত হয়ে আসব আর প্রেমার দন্ত—মায় দন্ত চূর্ণ করে দেব। যার তার সাথে মস্কারী!

মোহিত এবার প্রস্তাব করিল,—স্যার, ওর দাঁত ভাংতে গেলেই পায়ের উপর পড়ে একটা বিশ্রী প্রহসন করে বসবে। ওটা বড্ড কাপুরুষ। আমার প্রস্তাব হচ্ছে—ওকে যে ভাবেই হউক, বিয়ে দিতেই হবে।

অজিত—আমি এ প্রস্তাবের সমর্থন করছি—

পশুপতি—এ হতেই পারে না—স্যারকে অপমান আর আমরা যাব তাকে বিয়ে দিতে—দেশশুদ্ধ লোকের মহাত্মা গান্ধী হতে এখনও ঢের দেরী, আমি কায়মনোবাক্যে এ প্রস্তাবের বিরুদ্ধতা করছি—

তার বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও ছাত্রবন্ধুর এ প্রস্তাবটি বড়ই ভাল লাগিল।—হ্যা—প্রতিশোধটা জেনারাস্ হওয়া চাই—তোমরা কি বল হে? সবাই—আপনি যা বলেন স্যার তাই।

এ সত্ত্বেও পশুপতি লর্ড কিচেনারের মত ভাব দেখাইয়া গম্ভীর ভাবে পা ফেলিয়া বাহির হইয়া গেল—দরজার কাছে

গিয়া ফিরিয়া বলিয়া গেল—আমি তা হলে Walk out করলুম—নরম পন্থা আমার নয়।

—পশুপতি ছেলেটা বড্ড Impulsive—তা ও গুরুজনকে অপমান করেছে বলে বড্ড লেগেছে—আচ্ছা,—এখন বল কি করে ওকে বিয়ে দেওয়ানো যাবে।

অজিত বলিল,—স্যার ও যখন বিয়ে করবেই না, তখন ওর কাছে গিয়ে বেশী বাক্যব্যয় করে লাভ নেই। ওকে ভেতর থেকে ব্যস্ত করে তুলতে হবে। তা হলে—আমার মনে হয়—ওর চাকরটাকে ঘুষ দিয়ে বাধ্য করে ওর খাবার জিনিষের সঙ্গে হেকিম জমান সাহেবের বাদশাহী হালুয়া ওকে খাইয়ে দিই না কেন—অম্‌নি বেগমের দরকার হয়ে যাবে।

বেশ বলেছেন, এদেশে ভাতার নাই, দত্তপাড়া যাই—বলিয়া মুখ ভেংচাইয়া মোহিত প্রত্যুত্তর করিল—বলি বাংলা দেশের পয়সা এম্‌নি করে ত দেশ থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। আর আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে গলা শুকোচ্ছেন। বলি, শক্তি ঔষধালয়ের মদনানন্দ মোদক দোষটা করলে কি?

আলোচনা এবার বেশ চলিতে লাগিল—

—বলি, মদনানন্দ মোদক ত আর অম্‌নি দেবে না—তাদের যে চার্জ্জ! পরকে হালুয়া খাওয়াতে অবশেষে আমাদের ডাল ভাতটাও আর জুটবে না—কাজ কি স্যার পয়সা খরচ করে? দু'পা হেটে একটা ফুটফুটে মেয়ের

জন্য ওকে মাষ্টার রেখে দিই না কেন? দু'দিনে না হউক দু' সপ্তাহে কাজ হাসিল হয়ে যাবে।

—হুঁ উনি মনে করেছেন—কবিবর সকাল সন্ধ্যায় কবিতা লেখার সময়টার এমন অপব্যবহার করতে রাজী হয়ে যাবেন! বেশ লোক চিনেছেন ত! রাস্তায় বেরুলে বেম্ম মেয়েদের জ্বালায় হাটবার যো থাকে না। কবিতো আর অন্ধ নন! হবার হলে কাজ কবেই হয়ে যেত!

—তা হলে আমি এক প্রস্তাব কর্‌ছি। Sealed tenders ইন্‌ভাইট করা যাক। অর্থাৎ কি না যে যত সস্তায় পারে এই সমস্যার সমাধান ক'রে পাঠিয়ে দিক। চাঁদা তুলে সব চেয়ে ভাল টেণ্ডারওয়ালাকে একটা উপহার দেওয়া যাবে!

—গ্র্যাণ্ড, ক্যাপিটাল—তাই হোক তবে—এখন স্যার উঠি একটু গড়ের মাঠে—হাওয়া খেতে—

যদু গোপাল এক পাশে চুপ করিয়া বসিয়াছিল। সবাই উঠি উঠি করিতেছে দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া বলিল,—আখ,—একটু—স্যার বসতে বলুন আমার প্রস্তাব—

"যদু বল্‌বে কচু" বলিয়া মধু মন্তব্য করিল, "ওকি বলবে স্যার আমিই বলে দিতে পারি—বলবে এস আমরা সকলে মিলে চাঁদা তুলে ওকে ফ্রান্সে পাঠিয়ে দেই—সেখানে মেয়েরা কোর্টশিপ করে—কয়েকদিনেই কাজ হাসিল

হয়ে যাবে—কিন্তু ঐ যে আমরা আগেই বলে দিয়েছি—চাঁদা ফাঁদা আমরা তুলতে পারব না। বাপ মায়ের পয়সা—এখনও আমাদের নয়—"

যদু গোপাল দমিল না, বলিল,—শুনেই যাও না—চাঁদা তোলার দরকারই হবে না—বলে দিচ্ছি—

সবাই এবার সমালোচনার জন্য কোমর বাঁধিয়া বসিল—

—আমাকে সামান্য কিছু খরচ দিতে হবে।

—কত ?

—আনা আটেকমাত্র—বিফলে মূল্য ফেরৎ !

—ধন্বন্তরী ! কিন্তু কেন ও কিভাবে ?

—সে বলতে পারব না—তবে ট্রামের ভাড়া এবং পোষ্টেজেই তা ব্যয় হবে আর আপার সার্কুলার রোডের মোড়ে, অবশ্য তোমরা স্যাঙ্কসন্ করলে—এই ধর না এক গ্লাস ঘোলের সরবৎ বা একটী ডাব—সেও তোমরা মনে রেখ ;—স্যার, কথা দিচ্ছি, ঐ আট আনার মধ্যে—ওর চেয়ে বেশী 'জেরা' করা নিষ্ফল।

সভাপতি মহাশয় আনন্দের অতিশয্যে নাচিয়া উঠিলেন বলিলেন, এই নাও আধুলী—তবে কাজে লেগে যাও—বুঝব,—নিউটনের পুনর্জন্ম হয়েছে—

যদু গোপাল আধুলী খানা ২।৩ বার পরখ করিয়া বলিল,

—স্যার, আপনারা এদিকে পাত্রী দেখতে থাকুন—সময় মত ডাক পড়বে।

১০

কয়েকদিন ছেলেরা টিকটিকি পুলিশের মত অলখ্যে যদু গোপালের গতিবিধি লক্ষ্য করিল। একদিন সে অদৃশ্য হইল। সাক্ষী প্রমাণ লইয়া ও সকল অনুসন্ধান করিয়া এইমাত্র জানা গেল, কে যেন তাহাকে শিয়ালদহের মোড়ে এক গ্ল্যাস ঘোলের সরবৎ খাইতে দেখিয়াছে।

সন্ধ্যা বেলার হাজিরায় কিন্তু যদু গোপাল হোষ্টেলে উপস্থিত! সকলে দৌড়িয়া আসিয়া ঘেরাও করিল এবং জেরা ধরিল। যদু শুধু নিবেদন করিল—ইন্দ্রজাল শীঘ্রই ফলপ্রসু হইবে।

পরদিন সন্ধ্যায় কবিবর প্রেমেন স্লিপ্ লিখিয়া পাঠাইল—স্যার, আমায় মাফ করুন। যদি অনুগ্রহ করে এখানে আবার পদধূলো দিতেন তা হলে বিষয়টা আবার বিবেচনা করে দেখতুম—আপনার ওখানে প্রায়ই লোকের ভিড় তা না হলে আমিই আসতুম।

চিত্তরঞ্জন বাবু হাসিয়া গড়াগড়ি যাইবার উপক্রম; একেই—বলে প্রতিশোধ! জবাব দিলেন,—নিশ্চয়ই আস্‌বো কিন্তু একটু বিলম্ব হতে পারে।

কতক্ষণ পরে ছাত্রবন্ধু চুপি চুপি ১১ নং কামরার কাছে আসিয়া কান দিলেন। শুনিলেন কবিবর কবিতা ভাজাইতেছেন,

—ঘোড়ায় যখন পাড়বে ডিম—

আমার আস্তাবলে—

কিহে ভায়া, একেবারে সমন? বলি ব্যাপারটা?—বলিয়া তিনি অট্টহাস্য করিয়া কামরায় ঢুকিলেন।

বসুন ই না স্যার—লম্বা কথা—অবশেষে ‘কল্পনা’ দেবীর সতীন ঘরে আনতেই হল—

—বটে, বটে—

—হ্যা, স্যার, আজ দুপুরে ‘বুদ্ধুদে’র সম্পাদকের কাছ থেকে পত্র পেলুম—লিখেছেন আমার নাকি বিয়ে করতেই হবে—যুক্তি দিয়েছেন—সশরীরা ‘পিয়া’র সংস্পর্শে নাকি আমার কবিতা আরও উচ্চ ধরণের হবে বলে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস! আপনারও কি তাই মনে হয় স্যার! এতে ভাববার নিশ্চয়ই কিছু আছে —নয়?

চিত্তরঞ্জন অবাক হইয়া গেলেন—যদু ছেলেটা বাস্তবিকই কি ধূর্ত্ত! শেষে কোথায় গিয়ে যোগাড় করেছে!—প্রকাশ্যে হাসিয়া বলিলেন,—হ্যা, ভায়া, সেদিন আমার যুক্তির পঞ্চম ধারা ত আপনি শুনলেনই না! সেও ঠিক এই ছিল। তা অত বড় একজন সম্পাদক যখন ঐ রকমই মনে করেছেন—তা হলে ত বলব আমার বড় একজন সমর্থক পেলুম। যোগাড় দেখব?

কবি বেজায় খুশী হইয়া গেলেন, বলিলেন,—স্যার, তা

হলে উপায় দেখতে হবে বৈ কি? ধরুন, যার তার মেয়ে —সে না হোক—যে সে মেয়ে ত আর আমার গ্রহণ করলে চলবে না—এই ধরুন না—একটু দেখে শুনে—তার মতিগতি—কবি প্রিয়া হতে হলে তার একটু কবিত্বে সাধ না হউক কবিত্বে স্বাদ—এ সব ত চাই ই—

—তা হলে আপনার পূরো ফরমায়েসটা?

—সে আর বেশীই বা কি—আপনাদের হাতেই ত ছেড়ে দিতে পারি—আপনারা যেটীকে নির্ব্বাচন করবেন আমিও তাতেই রাজী—তবে ধরুন স্যার—সুস্থা, সবলকায়া. সুগঠন, ষোড়শী, রূপসী ;—সুহাসিনী, সুবাসিনী, কাব্যামোদিনী—কথা বললে মুক্তা ঝরে, হাসলে বিদ্যুৎ চম্‌কে, অভিমান করলে মেঘ জমে, রাগ করলে ঝড় বয়, নাচলে পায়ে পায়ে কবিতা রচে—আর নেহায়েৎ মরলে কিছু টাকা আসে—বুঝলেন স্যার—টাকা আমার যথেষ্ট আছে কিন্তু একটা বিরাট কিছু করবার আশা আছে বলেই টাকার কথা বললুম—তা এসব ত আপনারা—দেখবেনই—

—তা হবে, দেখব'খন কতদূর করা যায়—

—শুনেছেন স্যার, গত মাসে বোবা গায়ক কাঁলা চাঁদ দাঁ কর্ত্তৃক গাওয়া আমার একটা গান রেকর্ডে বেরিয়েছে—

—বটে বটে,—তা হলে ত সেটা বধির শ্রোতারাই বেশী শুনবে—

—ঠাট্টা করছি না স্যার—কাঁলা চাঁদ গাইতে ত পারে না শুধু নাকের ফাঁক দিয়ে বাজায়—তাই রেকর্ড করা হয়েছে—বলতে পারেন, গজলের কেবল সুরটা—দারুন বিক্রী হচ্ছে—

চিত্তরঞ্জন এবার উঠিলেন। কবির ঝোক আবার ঐ দিকে—কবিতা শোনাবার পালা শুরু করলে আর শেষ সহজে হবে না! বলিলেন—ওটা, আবার হবে—এখন যে অত বড় ভারটা আমার ঘাড়ে চাপালেন তার চিন্তে করতে হবে ত।

১১

দুইদিন পরে বড় বাজার পত্রিকার সদর মফস্বল উভয় সংস্করণেই—বড় বড় অক্ষরে বিজ্ঞাপন বাহির হইল—

পাত্রী চাই—চাই পাত্রী

একজন খ্যাতনামা উদার মতাবলম্বী কবির জন্য—সুশ্রী, সুন্দরী, স্বাস্থ্যবতী, শিক্ষিতা, সঙ্গীত শিল্পে শিক্ষাপ্রাপ্তা, কাব্যামোদিনী, গৃহকর্ম্মাভিজ্ঞা, ষোড়শী পাত্রী চাই (জাতি বিচার নাই)। পণ অনাবশ্যক—তবে অর্থশালী পিতা চাই। পিতা বা পাত্রী স্বয়ং পত্র বিনিময় করুন। বক্স নং ৪৯ c/o বড় বাজার পত্রিকা, কলিকাতা।

বড় বাজার পত্রিকার দৈনিক নীট বিক্রয় সংখ্যা ৬০ হাজারের অধিক হইলেও প্রায় দশ দিনের বিজ্ঞাপন প্রকাশে শুধু অর্থ ব্যয়ই হইল! চিত্তরঞ্জন বাবুর চিত্তে প্রসন্নতা আসিল না।

ডাকের পর ডাকে পত্রিকা অফিস হইতে ফেরৎ পত্রের খোজ করিলেন কিন্তু কোন উত্তর পাওয়া গেল না।

সকল শুনিয়া কবিবর রাগিয়া উঠিলেন, বলিলেন,—সত্যই স্যার, বাংলার মেয়েরা এখনও কবির উপযুক্ত সম্মান করতে শিখে নি।

—বটেই ত! আমার মনে হচ্ছিল এই যে অসংখ্য স্কুল কলেজের মেয়েরা ছুটোছুটী করছে? এদের বিয়ে করতে হবে না, তবে বোধ হয় আমাদের ষ্ট্যাণ্ডার্ডটা একটু উচু হয়ে গেছে; একটু কমটম হলে চলবে ত ভায়া—

—কেন হবে না?—তবে একটা দরখাস্তও ত পড়েনি—বলি এই যে মিস হেনা, টগর, জুই, গোলাপ, জবা ইত্যাদি বাগানশুদ্ধ—অথবা আম, জাম, কাঠাল ইত্যাদি জঙ্গলশুদ্ধ মেয়েদের পাল স্কুল কলেজে ছুটোছুটী করছে, এদের কি বিয়ে করতে হবে না? না হয়, স্যার, আমি মুসলমান হব।—চিত্তরঞ্জন মুখ ভারী করিলেন।

—ভুল বুঝবেন না স্যার, জাতি বিচার নাই এত বিজ্ঞাপনেই দিয়েছেন।—ওদের মধ্যে যে বিধবারাও বিয়ে বসেন! এই যে মাঝে মাঝে সাময়িক পত্রিকায় কবিতা লেখেন ওদের যদি স্বামী মারা গিয়ে থাকে তা হলে বোধ হয় রাজী হয়ে যাবেন—এই ধরুন না দেখ্ছি মিস্ বা মিসেস হাসান, হোসেইন, মোহসেন, —অথবা ধরুন না—জাহানারা, বাঙ্গালারা, দুনিয়ারা, জঙ্গলারা, পেখম ধরা, হুকুমতাড়া, মানুষমারা—

—ওঃ আবার আপনার কবিতা শুরু হল, বলছি—

—না স্যার, আমার আর সহ্য হয় না। না হয় আমি খৃষ্টান হব—আমি খৃষ্টান হব—সম্পাদক বলেছেন, খাটী প্রেমের স্বাদ না পেলে আমি যে কবিতা সাধনায় ব্যাহত হব,—ব্যাহত হব—ওদের মধ্যে লুসি, বুসি, কুসি, জুসি, পুসি—ক ত র ক ম মেয়ে!— কবির উচ্ছ্বসিত ভাবাবেগের উপশম হইলে চিত্তরঞ্জন কয়েকদিনের অবকাশ লইয়া কামরায় ফিরিলেন। বিজ্ঞাপনটীর সূক্ষ্ম সমালোচনা করিয়া বুঝিলেন, 'জাতি বিচার নাই' এবং 'পাত্রী স্বয়ং পত্র বিনিময় করুন' কথাগুলিই উহার কার্য্যকারিতা ব্যাহত করিয়াছে। সনাতন জাতি প্রথার লোপ মহাত্মারা আকাঙ্খা করিলেও পাত্রীর পিতারা তখনও চাহেন নাই এবং পাত্রীদেরও স্বয়ম্বরা সাজিবার সাধ ততটা হয় নাই।

১২

পাঁচ দিন পরে কবিবরকে হোষ্টেলের পাশের বাড়ীর নীচের কামরাটীর জানালার অপর দিকে বসাইয়া মনের মতনটীকে নির্ব্বাচন করিবার নির্দ্দেশ দিয়া, চিত্তরঞ্জন বাবু ইণ্টারভিউ করিতে বসিয়া গেলেন। উঃ সে কী দারুণ ভীড়! ঠেলিয়া ফেলা যায় না। বিজ্ঞাপনটি পরিবর্ত্তন করিয়া 'শিক্ষয়িত্রী চাই' বলা হইয়াছিল; তাই ষোল বৎসরের স্কুলের ছাত্রী হইতে পঞ্চাশ বৎসরের গৃহকর্ত্রী পর্য্যন্ত—আসিয়া উপস্থিত! কাহাকে পড়াইতে হইবে, কয় ঘণ্টা,

৮—

কত মাহিয়ানা ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে ছাত্রবন্ধুর দফা রফা! পরদিন নোটীশ দেওয়া হইল আপাততঃ আর ইণ্টারভিউর দরকার নাই।

কবিরাজ সন্ধ্যায় মত দিলেন,—ঐ যে স্যার, সবুজ সাড়ী পরা সুন্দরী মেয়েটী আপনার কথায় কেবলই হাসছিল, ওর খোঁজ নিন না।

১৩

হাফিযের ভূতপূর্ব্ব প্রতিদ্বন্দী ও 'কল্পনা' দেবীর একচ্ছত্র স্বামী—প্রেমের ইন্দ্রের বিবাহ হইয়া গেল। কয়েকদিনে কায়িক সংস্পর্শ হইয়া থাকিলেও স্বামীস্ত্রীর মানসিক বোঝা পড়াটা বিশেষ হইতে পারে নাই। কবির উচ্ছ্বসিত প্রেম-পত্রের উত্তরে যখন সলজ্জ হাতের নিরেট গদ্যে কয়েকটী মাত্র সংক্ষিপ্ত লাইনের চিঠি আসিল, কবির তখনকার অবস্থা দেখিলে মনে হইত, বিবাহ ত হয় নাই, হইয়াছে বিরহ অথবা বিচ্ছেদ্! কবি গাহিলেন—

সুখের লাগিয়া এ ঘর বাধিনু—
সকলই অসার হল—
শুইব বলিয়া বিছানা করিনু— —

'আসুন স্যার, ভাবছি—আমার কি হ'ল,—চোখের বাছাই শেষে বালাই হল—কবিত্বের লেশমাত্র তার মধ্যে আছে বলে আমার মনে হয় না স্যার,—দেখুন কি ছাই লিখেছে—

—অধীর হবার কিছু নেই; কাছে রেখে হাতে গড়ে তুলুন না কেন?—বলিয়া চিত্তরঞ্জন বাবু আশ্বাস দিলেন।

—তবে আমার পড়াশুনোটা?

—সেও ত বাসা থেকে চালান যায়। ভেবে দেখুন, এখনও নিরাশ হবার কিছুই নেই।

হঠাৎ কবিবরের মনে হইল, ভাবী শ্বশুরের টাকা দিয়া তাঁহার মস্ত একটা কিছু করিবার ইচ্ছা ছিল।

১৪

শ্বশুরের দেওয়া হাজার কয়েক টাকা ও নিজের যথা-সর্ব্বস্ব লইয়া কবিবর প্রেমেন্দ্রনাথ যে একটা বিরাট 'কিছু' জাঁকিয়া বসিলেন তাহা নারিকেল ডাঙ্গাস্থিত বিপুল কারখানা। দূর হইতে দেখিলে মনে হইত বুঝি বা এটা একটা নারিকেলের তৈল বা হুকোর কারখানা কিন্তু নিকটে আসিলেই চোখে পড়িত বড় বড় অক্ষরে লিখা কতগুলি নোটীস বোর্ড। প্রথমটীতে—

বিশ্ববঙ্গ কবিতা কার্য্যালয় (আনলিমিটেড)

স্থাপক—অধ্যক্ষ-কবিকুলশিরোমনি প্রেমেন্দ্রনাথ মজুমদার

যিনি

কাব্য জগতে যুগান্তর আনিয়াছেন; কবিতা চর্চ্চার large-scale ব্যবস্থা করিয়া সারা বিশ্বের নেতৃত্ব লাভ করিয়াছেন; কবিতা ও কাব্যকে অন্যান্য উন্নতিশীল

ব্যবসায়ের পর্য্যায়ে ফেলিয়া এবং সমৃদ্ধিশালী করিয়া বাংলার মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন; প্রয়োজন মতে ঘণ্টা কয়েকের নোটীসে বাংলার সহর ও পল্লীতে যে কোনও বিষয়ে, যে কোনও ছন্দে, যে কোন আকারের কবিতা, গজল বা গান, খুচড়া ও পাইকারী দরে সরবরাহ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। শত শত বেকার যুবক যুবতীকে হাতে কলমে শিক্ষা দিয়া মানবতার মুখোজ্জ্বল ... ... ইত্যাদি ইত্যাদি করিয়াছেন, করিতেছেন এবং করিতে থাকিবেন। —

দ্বিতীয় বোর্ডে অভিমতের ছড়াছড়ি :—

সর্ব্বজনখ্যাত বাংলার গৌরব স্যার প্রাণতোষ মুখোপাধ্যায় বলেন,—কবি প্রেমেন্দ্রনাথের উর্ব্বর মস্তিষ্ক যে শুধু কবিতা রচনায়ই নিযুক্ত থাকে তাহা নহে; তাঁহার সংগঠনশক্তি দেখিয়া যার পর নাই সন্তুষ্ট হইলাম। বস্তুতঃ এই কারখানা জগতে যুগান্তর আনিয়াছে ...ইত্যাদি।

অমর নাটককার ও অভিনেতা স্বর্গীয় ক্ষিতিশচন্দ্র ঘোষ পরপার হইতে বলিয়া পাঠাইয়াছেন,—তাজ্জব ব্যাপার! আমি বাঁচিয়া থাকিলে আমার নাটকগুলি যে প্রেমেন্দ্রের কারখানা হইতে লিখাইয়া লইতাম সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ কাহারও থাকা উচিত নহে।

ব্যবসা জগতের রকফেলার স্যার এস্., এন্. মুখার্জ্জী বলেন,—ইহাও কি সম্ভবপর? লৌহ লক্কড়ের ব্যবসায়ে আমার জ্ঞান আছে কিন্তু মানসিক ব্যাপারে এত বড় অনুষ্ঠান যে হইতে পারে সে বিষয়ে কখনও ভাবিতেও পারি নাই। আমার কারবারের যাবতীয় বিজ্ঞাপনই যে এই কারখানা হইতে লিখাইয়া লইব এ বিষয়ে কবি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন।

আগামী বৎসরে জন্মগ্রহণ করিয়া সাহিত্য সাধনায় অমর হইবেন শ্রীমান বসন্তচন্দ্র (বা কুমার) চট্টোপাধ্যায় উল্লাসে মাতৃগর্ভ হইতে আকারে ইঙ্গিতে জানাইয়াছেন—আমার ভবিষ্যৎ জন্মকে সার্থক মনে করিতেছি। পৃথিবীতে আসিয়াই এই অভাবনীয় কারখানা দেখিতে পারিব বলিয়া মনে হইতেছে একটু সকাল সকালই যেন আসিয়া পড়ি।

কবীন্দ্র সুর্য্যেন্দ্র নাথ বসু রোগশয্যায় জীবন মরণের সন্ধিক্ষণে দাঁড়াইয়া আফশোষ করিয়াছেন,—বাঁচিবার আমার সাধ নাই, মরিতেও আপত্তি থাকিত না, তবে উদীয়মান কবি প্রেমেন্দ্রনাথের অপূর্ব্ব কারখানার কি পরিণতি তাহাই দেখিবার জন্য কয়েকটা দিন বাঁচিয়া গেলে সুখী হই।—হয়ত ভগবান আমার সাধ পূর্ণ করিবেন।

এতদ্ব্যতীত ভূত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যতের অসংখ্য সাহিত্যিক, কবি, ব্যবসায়ী, ডাক্তার, কবিরাজ ইত্যাদি যাহা যাহা বলিয়াছেন, বলিতেছেন এবং বলিবেন তাহার কিয়দংশও বিজ্ঞাপনে প্রকাশ করিতে হইলে বহু অর্থব্যয় হইবার সম্ভাবনা। ইত্যাদি, ইত্যাদি।

তৃতীয় বোর্ডে দৈনন্দিন বিজ্ঞাপনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে :—

১। সদ্য বাহির হইয়াছে—

বউ কথা কও—বউ কথা কও (ছন্দ)

এই ছন্দে বিরহ ও মিলন, ক্লেদ ও আনন্দ, দুঃখ ও সুখ সমানভাবে ব্যক্ত করা চলে। হতাশ বা মিলন প্রয়াসী প্রেমিক-প্রেমিকা সত্বর হউন।

২। চাচার লাঙ্গলে কি গুণ!

শুকনো ক্ষেতে চাষ করিয়ে

—লাগাইছে বেগুন! (ছন্দ)

রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বীকে বিদ্রূপ করিয়া বা খোঁচাইয়া কাবু করিতে এই ছন্দের তুল্য আর নাই। আসন্ন ভোট উপলক্ষে ইহার আবিষ্কারকে **Inspiration** ছাড়া আর কি বলা যায়? ভোটযুদ্ধে আগুয়ান, সত্বর হউন।

৩। পাক্কা তেতুল কাচ্চা তেতুল (ছন্দ)

বীররসের অবতারণা করিতে হইলে ইহা ছাড়া উপায়

নাই। পণ্টনের মাঠ হইতে অসংখ্য অর্ডার পাইয়াছি। আগামী মাসে নিউ ইয়র্স্ ডে প্যারেডে ইহা ব্যবহৃত হইবে। খেলাফাৎ আন্দোলনের সেবকগণ, অসহযোগী ভলাণ্টিয়ারগণ, পান, তামাক, মদ, গাজা নিবারণী সমিতির সভ্যগণ, বেশ্যা-প্রথা-নিয়ন্ত্রণী নারী—স্বেচ্ছা-চারিনীগণ,—সত্বর হউন; সত্বর হউন; বিলম্বে হতাশ হইবার সম্ভাবনা।

(সর্ব্বস্বত্ব বিশ্ববঙ্গ কবিতা কার্য্যালয় আনলিমিটেড কর্ত্তৃক সংরক্ষিত।—)

(Guaranteed Original by the Company.)

N. B.—ম্যানুফ্যাকৃচারিং ডিপার্টমেণ্টে খোজ করিলে ছন্দের জন্মের তারিখ ও বেলা ও জনক বা জননীর বিবরণ ও পরিচয় পাইতে পারেন।

(Cheapest in the World—Notify own requirements to the Order Department.)

*　*　*

অসংখ্য ডিপার্টমেণ্টে কাজ চলে। অর্ডার ডিপার্টমেণ্টে হুলস্থূল, যেন শিয়ালদহ ষ্টেশনে পূজার সময়ের থার্ডক্লাস টিকিট ঘর। অসংখ্য তার আসিতেছে। কাজের ভীড়ের নমুনা দেওয়া মুস্কিল।

বেলা ১০টা ৫ মিনিট—তার আসিল—

কমিশনার—আগামী—কল্য—স্কুল—পরিদর্শন — উপযুক্ত

—সম্ভাষণ — পাঠান — লোক-মারফতে — নাম—N. G.—White—C. I. E.—I. C. S.

বেলডাঙ্গা হাই স্কুল,
মুর্শিদাবাদ।

বেলা ১০টা ৮ মিনিট—

ওহে—N. G.—Black-বলিয়া—"ফিরে যাও—ফিরে যাও" মর্ম্মে—শোভাযাত্রাগান—পাঠান-লোক-মারফৎ—

বেলডাঙ্গা স্বরাজ অফিস,
মুর্শিদাবাদ।

লোকজন ঠেলিয়া ফেলা দুস্কর,—চীৎকার কলরব!

—আজ্ঞে ছেলের বিবাহ—

—মশায়, বাবার মৃত্যু—

—শুনেছেন,—ছোট ভাইর অন্নপ্রাশন—

উঃ ভীষণ ঠেলে দিলে যে—মশায়, আরও কর্ম্মচারী ডাকুন—

—হবে? না ফিরে যাব?

—কেহই পূরোভাবে নিবেদন করতে পারছে না—একী ব্যাপার?—বয়,—জনদশেক এসিষ্ট্যাণ্ট ডেকে আন—কুলোতে পারছি না—সবাই একটু দেরী করুন—Busy season—কাজ দিতে পারব—হ্যা আপনি মশাই অনেকক্ষণ থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অন্য সবাইর গুতো সইছেন—বলে ফেলুন ত—আপনার ফরমায়েসটাই আগে নিই।—

—মশাই, কাজ দিতে পারবেন নি ?

—সে কি গো ? কারখানা খোলাইত সেই জন্যে—

—খুব তাড়াতাড়ি দরকার যে—একখানা বই লেখছিলাম—

—বেশ্ করেছিলেন—তারপর ? কি বিষয়ে ?

—যৈন বিজ্ঞান।

—নাম ?

—যৈবন রথে।

—তার পর ?

—"টাইট ব্রেষ্টের" একটা বিজ্ঞাপন দিতে চাইছিলাম—কবিতায়ই ভাল হইব—তাড়াতাড়ি দিতে পারবেন ? বই ছাপা হইবার লাগছে—

—নিশ্চয়—ছন্দ ?

যে —কোনও ছন্দে হইলেই হয়—

—আচ্ছা, শুনুন—

কী দুর্দ্দশা বাঙ্গালীর—লক্ষ লক্ষ—
বক্ষ হেরি—পড়িছে অকালে—

—বেশ, বেশ, খুব ভাল হইব, কাল নিবার আসমু।—

—আচ্ছা, নমস্কার ! সময় কম—বয়, প্রোসেস্ ডিপার্টমেণ্ট।—

১৫

ব্যবসায়ে উন্নতি হইতে থাকিলেও কবির দাম্পত্য জীবনে কী যেন একটা অশান্তি রেখাপাৎ করিল। প্রথম প্রথম কিন্তু

কবিগত প্রাণা স্ত্রী আশালতা কবির আপ্যায়নে গভীর ভালবাসারই পরিচয় পাইয়াছিল। প্রতিদান করিতেও সে কুণ্ঠিতা হয় নাই। আদর সোহাগের উত্তর দিতে যাইয়া ভাবাবেশে সে বলিয়া উঠিত—কবির প্রেম কী গ ভী র প্রেম! কবিও বলিতেন, জগতে ভালবাসতে জানে শুধু কবি!

আশালতার ভাবান্তর উপস্থিত হইল কয়েকবার কারখানায় আসিবার পর। এ কি ব্যাপার! মানবতার যে পরম সত্যিকার ভাবাবেশ—এমন করে তার অসাধু ব্যবহার? এই যে জন্ম, মৃত্যু, সুখ, দুঃখ, নিন্দা, স্তুতি—সকলই একইভাবে ফরমায়েস মত কবিতায় জোর করিয়া ফোটান হইতেছে এতে কি কবিতার সার্থকতা বা কবিত্বের মহত্বকে ক্ষুণ্ণ করা হইতেছে না!

হঠাৎ তাহার মনে পড়িয়া গেল কোন্ ধর্ম্মগ্রন্থে যেন পড়িয়াছে—কবির বাক্য ও কার্য্যে সামঞ্জস্য খুব কমই থাকে! তাহার মুখ ম্লান হইল।

১৬

সেই সন্ধ্যায় কবির সোহাগে আশালতার মন প্রফুল্ল ত হইলই না, পরন্তু কবির সবচেয়ে বিসদৃশ লাগিল যখন স্ত্রী তাহার কর্কশ গালিগালাজে হাসিয়া ফেলিল! বটেইত! কবির অপমান!

যাহা হউক রাত্রিটা একত্রবাসে কোনমতে কাটিল। সকালে যখন কবিবর সোহাগে নির্দ্দেশ করিলেন,

ওঠো বধূ, মুখ ধোও, পর নিজ বেশ
আপন কাজেতে মন করহে নিবেশ,—

তখন আশালতা মাথা ধরিয়াছে বলিয়া কোথায় অদৃশ্য হইল।

দিনের পর দিন কাটিল, আর ক্রমেই দাম্পত্য জীবনের এই অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতির কথা ভাবিয়া ভাবিয়া কবির মন তিক্ত ও বিরক্ত হইয়া উঠিল।

তবে কি স্ত্রীর অনুরক্তি—? ভাবিতেও কবির শরীর কাঁটা দিয়া উঠিল!

আশালতা সকালসন্ধ্যায় দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া নিবেদন করিত—প্রাণেশ্বর আমায় ভুল বুঝো না। হয়ত তোমার গভীর প্রেমের উপযুক্তা আমি নই।

জগতের ভূত-ভবিষ্যৎ সকল প্রেমিক প্রেমিকার মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে পটু হইলেও স্ত্রীর এই পরিবর্ত্তনের কোন কারণই কবি বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না।

১৭

সেদিন সন্ধ্যায় বিরাট কাব্য-জলসা! কবি লাহোরের এক কাব্য-জল্‌সায় উপস্থিত থাকিয়া দেখিয়া আসিয়াছেন, কবিরা এবং শ্রোতারা ভাবাবেশে কি উৎসাহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাই এই ব্যবস্থা।

বিজ্ঞাপনের বিপুল আয়োজন করা হইয়াছিল। বিরাট

জনসমাগম! কারখানার হলঘরেই অধিবেশন। বাঙ্গালী পুরুষ এবং মেয়েরা জুড়িয়া বসিয়াছে; এমন কি কাব্যামোদী বিহারী, উড়িয়া, পাঞ্জাবী, মারওয়াড়ীও অনেকে যোগদান করিয়াছেন।

প্রেমেন্দ্রনাথ অনেক বলিয়া কহিয়া স্ত্রীকে লইয়া আসিয়াছেন। স্ত্রী যে নিশ্চয়ই খাঁটী আমোদ উপভোগ করিবেন, তাহাতে তাঁহার কোন সন্দেহই ছিল না।

প্রায় সবাইর হাতেই নোটবহি, কাগজ, কলম; কবি সকলের অভিমত চাহিয়াছেন,—এমন জল্‌সা বৎসরে কয়বার বাংলার নরনারী চাহেন।

সভাপতি—কবিকুল শিরোমনি (অবশ্য প্রেমেন্দ্রনাথকে বাদ দিয়া)—হরিহরচন্দ্র সেন কবিরত্ন।

উদ্বোক্তা—কবি-রাজ—প্রেমেন্দ্রনাথ, যিনি ইত্যাদি ইত্যাদি······করিয়াছেন।

জল্‌সা বসিলেই কবিতা পড়ার পালা শুরু হইল।

বিষয়—"পিয়ার স্বরূপ"—ছন্দ—যাহার যাহা ভাল লাগে। (গদ্য-কাব্যের প্রচলন তখনও হয় নাই।)

১নং কবি পড়িলেন,—

> পিয়ার উদ্দেশে আমি হব দেশান্তর,—
> দাও দাও মোরে দ্বীপান্তর——

বিহারী শ্রোতা—কিয়া কাহা? দেশ ছোড়কে চলে যায়ে গা—?—বহুত আচ্ছা, বহুত আচ্ছা—(হাততালি)।

কবি——আমার এ ছিন্ন ফুলডোর—

দায়ী তার লাগি—পিয়া মোর——

সকলে সমঃস্বরে——Grand, Capital, বহুত আচ্ছা, বহুত আচ্ছা—চমৎকার !

১নং কবি পড়িলেন—,

হে আকাশ ভেঙ্গে পড় মাথায় আমার—

—আমি আর পারি না সহিতে ··· —

নারোয়াড়ী শ্রোতা—মুস্কিল !—হামলোক কাহা জায়েঙ্গে এভি ?—তবভি-বহুত খুব !—কিয়া কাহারে ? (হাততালি, মুচকি-হাসি, গোঁফে হাত বুলান।)

কবি—মিনতি আমার-শুধু মাথাটী তাহার—(কান্নাকাটি)—

—আমি আর পারি না—পড়িতে—

(এঙ্কোর প্লীজ—দো বারা কাহিয়ে—এসিকো কাহতে হ্যাঁয় প্রেম—ইত্যাদি।)

৩নং কবি—ফাঁক্ হয়ে যাও মাটী ঢুকে পড়ি আমি—

পিয়ার বিরহে আমি—জানে শুধু অন্তর্য্যামী—

(হাততালি—লম্ফঝম্প প্রদান—প্রশংসায় চীৎকার—কলরব ইত্যাদি।)

* * *

৭নং কবি সসম্মানে শেষ করিলে, প্রেমেন্দ্রনাথ উঠিলেন। সভাপতির দিকে চাহিয়া অভিবাদন করিলেন,—স্যার, একটা নিবেদন করে নিই,—

—বেশ্-করুন না—

—সমবেত সুধীবৃন্দ এবং ভদ্রমহিলাগণ,

—আপনারা এতক্ষণ যাদের কবিতা শুনলেন, এরা অনেকেই আমারই কারখানায় শিক্ষিত। ভাবের আবেগে জগতে ইহাদের সমকক্ষ খুব কমই আছে। কিন্তু তারা অনেকেই অবিবাহিত বলে তাদের অশরীরা পিয়ার উদ্দেশে একটু অবাস্তর ভাবেই ব্যাকুল হয়েছে। আমারও একদিন এমনই মনের ভাব ছিল ; তবে একজন সম্পাদকের অনুরোধে বিয়ে করে এখন একটু সংযত হয়ে পড়েছি। তাই আমার এখনকার কবিতায় অতিরঞ্জন বড় একটা দেখতে পাবেন না— প্রগাঢ় বাস্তব প্রেমের অনুভূতিই আমায় এখন পীড়া দিচ্ছে—

তারপর কবি "কাচ্চা তেতুল—পাকা তেতুল" ছন্দে আরম্ভ করিলেন,—

পিয়ার স্বরূপ

(ও সে)	চায় না মদ	চায় না সুরা,
	মা দকতার	তাল বেসুরা ;
	কি দেয় মদে ?	চ পলতা,
	সে কি আনে ?	ক পটতা।

কবির প্রেম

আমার পিয়া ছল্ জানে না,
গিল্টী সোনায় বুঝবে সে না ;
পরশে তার কী ক্ষমতা !
চা হনীতে গ ভীরতা !

আমার পিয়া চায়না ঘটা
আয়োজনে বড্ড চটা ;
না দেয় ধরা ফুলের বাগে
গাঙ্গের ঘাটে গীতের রাগে !

আপন মনে স্বা ধীনা সে ;
হার মানিতে রা জী না সে
সে ধায় আপন নীরব রথে
আপন মতে বিজন পথে।

আ ড়ম্বর——— বিহী নতা
খাটী প্রেমে—— বিলী নতা
সে চায়—ও তার অভাব কিসে ?
অভাব নিয়ে ফো টেনি সে।

কবির প্রেম

কা তরতা আঁখি পাতে
হেরে যদি পিয়া মাতে,
বুকের মাঝে আসন লবে
মনের মাঝে অটুট রবে।

ঘৃ চাবে সে সব অভাবই
জা গাবে সে সকল ভাবই;
অনিত্য সুখ সা ধিবে না
অলীক প্রেম ফাঁ দিবে না।

বুকের আশা মুখের বাঁধ
চোখের নেশা মনের সাধ
মিটে, কাটে, ভাঙ্গে, পূরে—
পিয়ার রূপে পিয়ার সুরে।

বিশ্ব প্রেমে প্রেম যোগায়,
নিত্য সুখে মন মজায়,
সদাই সবার পূজা রিণী
তবু নয় সে দ্বিচা রিণী।

নয় কি হায় অ পরূপ ?
আমার পিয়ার এ স্বরূপ ?
রূপে তারে সবাই চিনে
স্বরূপ জেনে কেবা জিনে ?—

সভাশুদ্ধ এবার প্রশংসায় মুখর হইয়া উঠিল। বাঙ্গালী, মাড়োয়ারী, উড়িয়া, বিহারীতে প্রায় ধ্বস্তাধস্তির উপক্রম! কবিবর কৃতজ্ঞভাবে অভিবাদন করিলেন।

পিয়ার গুণকীর্ত্তন করিয়া সারিয়া এবার তাহার ভাবান্তরে কবির ক্ষেদ! আশালতাকেই বোধ হয় শুনাইতে যাইয়া তিনি উপসংহার করিলেন—

—কিন্তু´ পিয়ার—ভা´ বান্তরে,
রাত্র´ দিন—চিন্তা´ করে,
তৃর্ণ সম—কৃশ ক্ষীণ
হ´য়ে´ গেছি—হায়—সেদিন,
—পিয়া´ খুঁজে—তাই আমারে,
—বি´ ছানাতে—পে'ল নারে।......

—কবিকে শেষ করিতে না দিয়াই সকলে আনন্দের আতিশয্যে হাততালী, লম্ফ-ঝম্ফ আরম্ভ করিয়া দিল। তুমুল হুলুস্থুল, হৈ চৈ!

* * * *

আশালতা সকলই শুনিল। সভাশেষে সভাপতি যে অভিমতগুলি পাইলেন তাহার মধ্যে ছোট্ট একখানা চিঠি তিনি বারবার পড়িতে লাগিলেন।

কবি আশালতাকে বাড়ী পৌঁছাইয়া ফিরিতেই সভাপতি তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন,—ত্মাখ হে কবি, তোমার স্ত্রী কি একটা নিবেদন করেছেন—

—আমার স্ত্রী ?—

—হ্যা, এই নাওনা—

কবি পড়িলেন—

কবিতা কার্য্যালয় ইত্যাদি

তাং—

শ্রদ্ধেয় সভাপতি মহাশয়,

কবিবর প্রেমেন্দ্র নাথের সহধর্ম্মিনী আমিই। আর যাহারই স্বরূপ তিনি বর্ণনা করুন, আমি যে তাঁহার বর্ণনার অযোগ্যা, সে বিষয় ভাবিয়া আমি বড়ই লজ্জিতা। তবে ইদানিং তাঁহার প্রেমোচ্ছ্বাসে আমারই ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছে। বস্তুতঃ এর জন্যে চিন্তা তিনি নিশ্চয়ই করিয়াছেন বা করিতেছেন কিন্তু তাই বলিয়া একেবারে বিছানায়ও তাঁকে পাইতে কষ্ট হয় বা হইয়াছিল একথা স্বজ্ঞানে বা স্বেচ্ছায়

কখনই আমি বলিতে পারিব না। তাঁহার পার্শ্বে বিছানায় জায়গার অকুলান হয় বলিয়াই জানি।

যাহা হউক, আমার নিবেদন, কবিবর আর যাহাই করুন, আমাকে তিনি পদ্যের পরিবর্তে গদ্যে ভালবাসেন, এমনতর বিধিব্যবস্থা করিয়া দিতে পারিলে আপনার নিকট চিরকৃতজ্ঞা থাকিতাম।

অপরাধ নিবেন না।

বিনীতা

আশালতা

ঠিকানা—কবিকুঠির,

নারিকেলডাঙ্গা—

প্রেমেন্দ্র পড়িয়া অবাক !

সেদিন রাত্রেই প্রেমেন্দ্র জিদ্ ধরিল,—বলি, এতদিন কেন তুমি আমায় বল নি ?

—ঠিক ধ'রে উঠতে পারি নি। কবিরা যাহা 'বলে' তাহা 'করে না' বলে কোথায় যেন পড়েছিলুম, আজ 'বিছানায় তোমায় পাই নে'—উক্তিতে তার সমর্থন হয়ে গেল। ক্ষমা করো আমায়—ভাবের আবেশে পত্রখানি লিখেছিলুম, নিবেদন ত' আমার তোমারই কাছে—

—হুঁ, বুঝলুম, আমার কবিত্বে তোমার এতটু কু ও আস্থা নেই—

আশালতা হাসিয়া উঠিল,—ছিঃ তুমি যে অ ত ব ড় কবি সেকথা কে না বল্‌বে ? আমি ত ছা র !

—শেষ কালে আমায় লজ্জা দিলে ?

—বাঃ রেঃ কে দিলে তোমায় লজ্জা ? আমি ত শুধু আমার খাঁটী মতই জানিয়েছি !

—বেশ করেছ ! তা হলে তোমার আমার সকল সম্বন্ধ ঘুচে গেল।

—বাঃ বল্‌লেই হল ? সে যে আরও বাহাল হল।

—ছাই হল ? আমি কালই বাড়ী ছেড়ে বহু দূরে চলে যাব—

—কি ? যাবে বল্‌লে ? তা' হলে বুঝলুম, তুমি বাড়ী থেকে এক পা—ও বাড়াবে না।

—না হলে নদীতে ঝাপ দিব—

—নদীর দিকে তুমি মু খও করবে না।

—আচ্ছা, দেখা যাক্ ! আজ রাত্রে গলায় দড়ি না দিই ত'—

—নিচের ঘরে দড়ি ত রয়েছেই ! কিন্তু আমি নিশ্চিন্ত —তুমি এক গাছা সূতোও ধরবে না।

—তুমি মস্কারী করছ ? তোমায় আমি ঘৃণা করি।—

আশালতা এবার কবিকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—হোঃ হোঃ তা হলে বুঝলুম, ঠাকুর, তুমি আমায় **বড্ড ভালবাস!** **বড্ড ভালবাস!**

*　*　*　*　*

পরদিন সকালে দেখা গেল, কবি বহাল তবিয়তেই আছেন। কয়েকদিন পরে জানা গেল, তিনি গদ্য লেখায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন এবং **কবিতা কার্য্যালয় সাহিত্য মন্দিরে** রূপান্তরিত হইয়াছে!

লাভষ্ট্রোক্ *

(Love-stroke)

১

চাকুরীটি আমার বিশেষ বড় নয়, তবে অসাধ্যসাধন আমাদের নিত্যকর্ম্ম। নাটক-নভেল লেখকেরা মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু আমাদের তাতে পাকা হাত। দিনগুলো বেশ কাটিয়া যাইতেছে; ছোটখাটো বিপদ্ দূরে থাকুক, বড় বড় কঠিন সমস্যাও এখন হেলায় কাটাইয়া দিই। কিন্তু প্রথম চাকুরী-জীবনে সামান্য একটি ব্যাপারেই বড় মুষড়াইয়া গিয়াছিলাম! দয়াময়ের উদ্দেশে কত কাতর মিনতি, নির্জ্জনে কত অশ্রুপাত! মনের সেই অস্থিরতায় ভবিষ্যৎ জীবনের প্রতি বড়ই আস্থাহীন হইয়া পড়িয়াছিলাম। এখন শুধু হাসি আসে সে কথা মনে পড়িলে।

সে বৎসর ট্রেনিং কলেজ হইতে পাস করিয়া আসিয়া আবার জেলায় কাজ শিখিতে হইল। প্রবেশনারী অবস্থার লাঞ্ছনা মনে পড়িলে ঘৃণার উদ্রেক হয়। কত লোকের ধমকানি, চোখরাঙানি যে সহ্য করিতে হইল! একদিন মনের দুঃখ খুলিয়া এক চার্জ্জ-অফিসার অর্থাৎ পাকা দারোগাজীর

* প্রবাসী—১৩৪১।

কাছে বলিলাম। বলিলেন,—"ওহে, আর একটু সবুরই কর না! দেখবে কত লোকের জানমালের মালিক হ'য়ে পড়বে। তখন তোমাকে খোসামদ না করে এমন লোকই এলাকায় থাক্‌বে না। ক্ষমতা হবে তোমার অসীম, দাপট হবে বিষম!"—আপাততঃ আশ্বস্ত হইলাম। শিক্ষাদীক্ষার চোটে এক রকম মনমরা হইয়াই গিয়াছিলাম; তাই কবে কখন এমন সুযোগ আসিবে তাহারই অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

আসিলও খুব তাড়াতাড়ি! গোয়ালদিঘী থানার বাসাগুলি সেবার ঝড়ে উড়াইয়া লইয়া গেল। চার্জ্জ-অফিসার অসুস্থ ছেলেমেয়ের অজুহাতে ছুটি লইয়া পলাইয়া গেলে, সাহেব আমাকেই ডাকিয়া হাসিয়া বলিলেন,—"যাও, কিছু দিনের জন্য তোমাকে গোয়ালদিঘীর চার্জ্জে পোষ্ট্ করা গেল। ভালমতে কাজকর্ম্ম করিও!"

লাইনে খবর লইয়া জানিলাম, বিবাহিত অনেকেই বাসা নাই এই অজুহাতে সাহেবের নিকট হইতে এই থানাটার পালা এড়াইয়া ফেলিয়াছে। আর আমি? আমি যে সদ্যবিবাহিত! একেবারে কাঁদিয়াই ফেলিলাম! লাইন বাবু বলিলেন,—"সাহেবকে বলা হয়েছিল কিন্তু তিনি ছেলেপিলেওয়ালাদের আপত্তি আরও বেশী গ্রাহ্য বলিয়া উহাকে উড়াইয়া দিয়াছেন।"

মনে মনে সকলের চৌদ্দপুরুষের গুণগান করিলাম, আর নব-দম্পতির অতি ন্যায্য অধিকারটুকুর দিকেও যাহারা চাহিল

না তাহাদের পারিবারিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও হিতকামনা করিয়া রওয়ানা হইলাম! স্বামীসুখবঞ্চিতা তরুণীর কর-কমলে হৃদয়ের গভীরতম ব্যথাটুকু জানাইয়া শুধু এই বলিয়া অশ্রুলিপি পাঠাইলাম,—দারোগাদের নৈতিক উন্নতি অবনতির জন্য দায়ী তাহাদের কর্ম্মপদ্ধতি!

পথ নৌকাযোগে। সময়টা আর কাটিতে চাহে না। মনের সেই বিরাগ, বিরক্তি মেজাজটাকে গরম করিয়াই রাখিল। থানাঘাটে যখন পৌঁছিলাম, তখন সংবাদ শুনিয়া সবাই ছুটিয়া অভ্যর্থনা করিতে আসিল। মাঝিদের সঙ্গে ভাড়া লইয়া একটু তর্কবিতর্ক হইতেই একেবারে জ্বলিয়া উঠিলাম। বেদম প্রহারে তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া কোথায় মিলাইয়া গেল তাহার আর খোঁজ মিলিল না।

বেতখানির সেই প্রথম সদ্ব্যবহার কিন্তু শাসনকার্য্যে আমার বড়ই সহায়তা করিয়া বসিল। "বাবু বড় কড়া," "ভারী তাঁর মেজাজ," ইত্যাদি কথা দুই-তিন দিনেই থানায় ও এলাকাময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িল।

২

ট্রেনিং কলেজে বড় বড় ওস্তাদের নিকট 'ল' পড়া হইয়াছিল। তাই আইনের ব্যবহারিক দিকটাও বেশ করিয়া আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছিলাম। শিক্ষকেরা সবাই ছিলেন অভিজ্ঞ—জীবনের শ্রেষ্ঠ অংশটা কাটাইয়াছিলেন দারোগাগিরি করিয়া:

চাকুরী-জীবনে আমাদিগকে দুইটি প্রধান তথ্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে হইবে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। একটি ছিল, Discarding of uncorroborated statement—অর্থাৎ যে কথার কোন উপযুক্ত সমর্থক না থাকে তাহার উপর ভরসা করিতে নাই। দ্বিতীয়টী Careful cross-examination of persons অর্থাৎ কাহাকেও বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে তাহাকে ভালমতে জেরা করিয়া লইতে হইবে।

তাই নিম্নতন কর্ম্মচারীরা যখন বলিয়া বসিত, আমরা সবাই এক একটি সেরা অফিসার, তখন তাহাদিগকে শুধু জেরা করিয়াই ব্যতিব্যস্ত করিতাম না, কাগজপত্র দলিল দস্তাবিজ তলব করিরা রীতিমত বিচারে বসিয়া যাইতাম। কয়েক দিনের মধ্যেই আব্দারের হাত হইতে রক্ষা পাইয়া বাঁচিলাম। সবাই বলিত, দারোগা বাবু ভারী নিটখুটে লোক বটেন, তাঁর কাছে ধাপ্পায় কাজ চলবে না।

সাক্ষী দিতে আসিয়া প্রায় সকলেই মুষড়িয়া যাইত। আমার সন্দেহসূচক বিস্ময়োক্তি শুনিয়া ও মুখের হাবভাব দেখিয়া তাহারা থামিয়া তলাইয়া দেখিয়া অতিশয় সঙ্কোচের সহিত জবানবন্দী করিত। জেরার চোটে ও মেজাজের দাপটে তাহাদের মুখ এতটুকু না হইয়া যাইত না। সবাই বলিত,—হুজুরের অসাধারণ তীক্ষ্ণবুদ্ধি।

কাজকর্ম্ম চলিল বেশ। ভাবিলাম যে রকম নাম করিয়া ফেলিলাম তাহাতে আর কোন কাজে বিশেষ আট্‌কাইতে হইবে না। মনটি মাঝে মাঝে ভক্তিরসে আপ্লুত হইয়া উঠিত আর ট্রেনিং কলেজের শিক্ষকদের উদ্দেশে প্রায়ই হাতজোড় করিয়া কপালে ঠেকাইয়া গোপনে প্রণাম করিয়া ফেলিতাম।

৩

একদিন বৈকালবেলায় আনমনে নদীর ধায়ে বেড়াইতে আসিলাম। সকলের সঙ্গে অবাধ মেলামেশার প্রশ্রয় কখনই দিতাম না, তাই থানার অন্য কাহারও আমার সঙ্গে আসার মত দুঃসাহস হইত না। তবে অন্যতম সহায় "বেত্রবর" অর্থাৎ শাসনদণ্ডখানি সর্ব্বদাই হাতে থাকিত।

খুলনা হইতে ষ্টীমারখানি আঁকাবাঁকা কাটা খালটি বাহিয়া আসিয়া ঘাটে লাগিল। হঠাৎ স্বামীসুখবঞ্চিতা তরুণী স্ত্রীর কথা মনে পড়িয়া গেল। এই খুলনায়ই তিনি বর্ত্তমান! শুধু কয়েক ঘণ্টার রাস্তার ব্যবধান; অথচ বহুদিন মিলন ঘটে নাই। মেজাজ রুক্ষ হইয়া উঠিল, রাগ করিবার মত কেহ সঙ্গেও ছিল না, তাই আত্মসংবরণ করিলাম।

ছাতা, লাঠি, বাক্স, পুঁটলী লইয়া যাত্রীরা দিগ্বিদিকে ছুটিল। তাহাদের মধ্যে ও-কে? কঠিন সুরে ডাকিলাম,—রজনী! ওদিকে কোথায় যাচ্ছিস্? আমি যে এখানে!

—নমস্কার বাবু মশাই। তাই ত! জরুরী খবর। বাবা আমায় পাঠিয়ে দিলেন, বললেন জামাইবাবুকে তাড়া ক'রে নিয়ে আয় গে।

নিমেষের মধ্যে বুকের রক্ত জমাট হইবার উপক্রম হইল। ব্যাপারটা তবে কি? বলিলাম,—হ্যাঁ, চল্ বেটা আগে থানায় যাই, তার পরে সব শুনব।

রজনী রজনীর মতই অন্ধকার-মুখে মাথা হেঁট করিয়া পিছু পিছু চলিল। থানায় পৌঁছিয়াই হাঁকিলাম, জমাদার বাবু! একখানা টেলিগ্রাফের ফর্ম্ম নিয়ে আসুন ত! খবর বিশেষ ভাল বোধ হচ্ছে না, তবে বেটাকে 'জেরা' করা যা বাকী।

ফর্ম্ম একখানার জায়গায় দশখানা আসিল ও ভক্ত প্রজাবৃন্দের মত থানার সবাই আসিয়া জড়ো হইল। আমি 'জেরা' ধরিলাম,—

—আচ্ছা, বল্ ত, তোকে কে পাঠালেন? তোর বাবা, মা, না তোর ঐ দিদিমণি, বুঝলি কি না ঐ আমার স্ত্রী।

—পাঠালেন ত বাবা, মাও নিকটে দাঁড়িয়েছিলেন। দিদিমণির সঙ্গে আসবার আগে আর দেখাই হয় নি।

—তবেই মেরেছে রে ব্যাটা? তিনি তবে কোথায় কি অবস্থায় ছিলেন শিঘ্ঘীর ক'রে ব'লে ফেল্!

জমাদার বাবু—শিঘ্ঘীর ক'রে বলতো বাপু!

—তা আমি মোটেই জানি নে। তবে বাবা, মা কি অবস্থায় কোথা থেকে হুকুম দিলেন তা বল্‌তে পারি বটে।

—বেশ, তাই বল্ দিকিন! শিঘ্‌ঘীর!

জমাদার বাবু—তাই ব'লে ফেল।

—আজ সকালবেলায় ঘুম ভাঙতে-না ভাঙতেই ডাক পড়ল—রজনী, রজনী! হাত মুখ তখনও ধুতে পারি নি। দৌড়ে গেলাম মাঝের কোঠায়। বাবু আমাকে দেখে নড়ে-চড়ে পাশ ফিরে শুলেন, মা পাশ থেকে ঘোমটা দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। বাবু জোরে হাই তুললেন, হাতের দশ-দশটি আঙ্গুল মটকালেন, তার পরে আস্তে আস্তে ভারী গলায় বললেন,—রজনী, যা একটু গোয়ালদিঘী,—এখনকার ষ্টীমারেই যা, জামাই বাবুকে নিয়ে আয়। বল্‌বি—বাবা আপনাকে অবশ্যই যেতে বলেছেন।

"শ্বশুর ভারী অসুস্থ, এক মাসের বিদায় চাই"—বলিয়া 'তার' লেখা হইল। জমাদার বাবুরা দুই জন, সিপাই জোঁড়া-তিনেক—সবাই "আমি 'তার' করে আসি," "নেই হাম যাতে হ্যায় দৌড়কে" বলিয়া যে কাড়াকাড়ি আরম্ভ করিল তাহাতে আমার প্রতি তাহাদের অটল শ্রদ্ধা না হউক তাহাদের উপর আমার যে অবাধ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ রহিল না। রজনী আমার বিরক্তিপূর্ণ রক্তিম চাহনি দেখিয়া সরিয়া পড়িয়াছিল। তাহাকে বাসায় লইয়া গিয়া

খাওয়াইবার ব্যবস্থা লইয়াও খুব কাড়াকাড়ি টানাটানি পড়িয়া গেল।

বিছানা, ট্রাঙ্ক্ বাক্স মালপত্তর ইত্যাদি কম ত নয়? সাজাইয়া-গুজাইয়া ষ্টেশনে আসিতে প্রায় নয়টা বাজিয়া গেল। ষ্টীমার তখনও দেখা দেয় নাই। মাষ্টার বাবু ‘চেয়ার’ ‘চেয়ার’ করিয়া অস্থির, শীঘ্র জোগাড় করিতে না পারিয়া নিজের আসনই ছাড়িয়া দিলেন।

বসিয়া সিগারেটের উল্টোদিকটা ধরাইয়া ফুঁকিতে ফুঁকিতে হাঁকিয়া ডাকিলাম, “রজনী, ব্যাটা এদিকে আয় ত ছুটে।”

বেচারা পিছনে মাথা গুঁজিয়াছিল, ভয়ে ভয়ে আসিয়া বলিল, “বাবু!”

—তোর মণিমালা দিদি কিছুই ব’লে দিন নি?

—বাবু, না তাঁর সঙ্গে ত দেখাই হয় নি?

—বলিস্ কি? কালও হয় নি।

—কাল বিকেলে, কি একটা কাজের জন্য ডেকেছিলেন, মুখচোখ তাঁর একটু ভারি বোধ হচ্ছিল।

—ব্যাটা গরু! আসবার সময়ে আবার একটু দেখাও ক’রে এলি নে।

—বাবু, না,—বাবা আমায় যে তাড়া ক’রে পাঠিয়ে দিলেন, তাতে ত আমি ছুটো মুখেও দিয়ে আসতে পারি নি।

শ্বশুর-মহাশয়ের এই অযথা তাড়াহুড়ার জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতে পারিলাম না। অসুস্থ মন লইয়াই ষ্টীমারে উঠিয়া পড়িলাম।

ইণ্টার ক্লাসের টিকিট হইলেও ফার্ষ্ট ক্লাসটা দখল করিয়া লইতে আর বেগ পাইতে হইল না। রজনীকে মালপত্তরের পাহারায় রাখিয়া গিয়া কেবিনে শুইয়া পড়িলাম।

'জেরা' করিয়া অন্য সব ক্ষেত্রে সুফল পাইয়া থাকিলেও এক্ষেত্রে কেমন যেন উল্টো ফলই ফলিল। শ্বশুর-মহাশয়ের হাইতোলা—দশ-দশটি আঙ্গুল মটকানো—মণিমালার চোখ মুখ ভারী—উঃ—কিছুই ত হদিস্ মিলে না! ইহার উপর ছারপোকার কামড়ে একেবারে ছটফট করিতে লাগিলাম। মনে করিলাম এ ক্লাসের যাত্রীরা নেহাৎ 'ভালমানুষ' হিসাবে বোকা, তাহা না হইলে তাহারা ষ্টীমার কোম্পানীর ভাড়া এবং ছারপোকা মাকড় ও জোঁককে গায়ের রক্ত দিতে কিছুতেই সম্মত হইত না।

৪

পরদিন সকালবেলায় খুলনা ষ্টেশনে পৌঁছিয়া জেটি পার হইতে-না-হইতেই "বাবা অনিল, এই যে তুমি এসেছ!—এই ঘোড়াগাড়ী—রজনী গাড়ীটা ডাক্ত"—ইত্যাদি চীৎকার করিতে করিতে স্বয়ং শ্বশুর-মহাশয় দর্শন দিলেন।—তাই ত —লোক না-পাঠালে কি আর তোমার আসা হত?—আচ্ছা,

আচ্ছা, থাম, পদধূলিটুলি নেওয়াটা, ও পূর্ব্বকালের অমার্জ্জিত প্রথা—বলি শরীর ভাল ত ?

গাড়ীতে উঠিতে উঠিতে বলিলাম,—আজ্ঞে হ্যাঁ, এক রকম ভালই—তবে মনে অশান্তি—এই যা ! বাড়ীতে কারুর অসুখ-বিসুখ নেই ত ?

দোলা খাইতে খাইতে—না ; বালাই, সবাই বেশ আছেন।

হঠাৎ সুখস্বপ্নে অচেতন হইয়া পড়িলাম। তা হ'লে ত তরুণী ভার্য্যার সহিত একমাস কালের অবিচ্ছিন্ন মিলন। সে যেন মূর্ত্ত হইয়া চোখের সামনে ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল। মনে হইল গাড়ী মোটেই চলে না, হাঁকিলাম,—এই বেটা—চা—লা।

কিছুক্ষণের জন্য অন্যমনস্ক হইয়া পড়ায় গুরুজনের বক্তৃতার অনেকটা ধরিতেই পারি নাই। কেবল শিষ্টতার খাতিরে হাঁ বা না করিয়া যাইতেছিলাম। উত্তর ঠিক না হওয়াই বোধ করি ক্ষেপিয়া গিয়া আমার হাতখানা ধরিয়া বেশ নাড়া দিয়া তিনি বলিলেন—বলি, শুনছ ত ? কাল রবিবার ও পরশু বন্ধ—এ-দুদিনেরই ছুটি নিয়ে এসেছ ত ? হঠাৎ মুখ শুকাইয়া গেল, সাহসে ভর করিয়া বলিয়া ফেলিলাম—ছুটি ত এক মাসেরই নিয়ে এসেছি। ব্যাপার গুরুতর বলেই মনে হয়েছিল। যাক্ কিছুদিন—

—ক্ষতি আর কিই বা হয়েছে? ছুটী ক্যান্সেল ক'রে জয়েন্ ত করাই যেতে পারে। বিষয়টা একটু খুলেই ব'লে ফেলি! কাল রাতে তোমার শাশুড়ী-ঠাকরুণ হঠাৎ বললেন,—অনেক দিন জামাই বেড়াতে আসে নি। তাকে একবার আনাও না। আমি বললাম, সে কি করে হ'তে পারে? সে এখন নূতন চার্জ্জ পেয়েছে। কাজের যে ক্ষতি হবে। দেখ, আমার মতে ছুটি-ফুটি ও-সব ঐ গোরাদের জন্যে। সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে ওরা আসে আর আমরা ত ধর না, এই বাড়ী বসেই চাকুরি করি। এই কত বছর জজের সেরেস্তাদারী করছি। ছুটি নিয়ে বসে থাকলে ত ওরা সবাই যা পারে লুটে নেবে। অসমর্থ হ'লে ত ওঁরাই আমাকে একেবারে ছুটি দিয়ে দেবেন! যত দিন শক্তি আছে—এই এসে পড়ল যে—রজনী তোর মাকে খবর দে—আমরা এসে পড়েছি।

শ্বশুর-মহাশয়ের পশ্চাতে পশ্চাতে ক্লান্ত দেহখানি ও বিরক্তিভরা মুখখানি লইয়া বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিলাম। শাশুড়ী-ঠাকুরাণীকে আর প্রণাম করাও হইয়া উঠিল না। নিতান্ত অশোভন না হইলে হয়ত বেতখানি অনর্থক রজনী বেচারার পিঠের উপর দিয়া চালাইয়া দিতাম। শাশুড়ী বলিলেন,—কি বাবা অসুখ-বিসুখ হয় নি ত? চেহারা ত একেবারে ছাই হয়ে গেছে—

—হ্যাঁ—একটু খারাপই লাগছে—বলিয়া যেন কাঁদিয়াই ফেলিলাম।

বাধা দিয়া,—ও কিছু নয়, ষ্টীমারের ঝাঁকানিতে একটু খারাপ লাগেই—এক্ষুনি সেরে যাবে—তুমি না-হয় একটু চা খেয়ে আরাম কর গে, আমার আফিসের সময় হয়ে এল—বলিয়া শ্বশুর মহাশয় সরিয়া পড়িলেন।

৫

ভিন্ন একখানি সুসজ্জিত কামরায় শুইয়া আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিলাম। মণিমালার আসিতে দেরি হইতেছিল। ভাবিলাম,—কপাল! এরা বুঝি সবদিকেই সমান! মেয়েটিকে অফিসে নিয়ে যান্ নি ত?

হঠাৎ অলঙ্কারের রুণুঝুণু শব্দে চারিদিক মুখরিত হইল। বুঝিলাম—প্রিয়তমার আগমন। অভ্যর্থনা করিবার মত উৎসাহ আর হইল না, রাগ তখনও পড়ে নাই।

নিজেকে নিজেই ইন্ট্রোডিউস করিতে বা বোধ করি বিলম্বের কৈফিয়ৎ দিতে গিয়া সে হঠাৎ থামিয়া গেল, বলিল,—উঃ তাই ত মা বললেন তোমার শরীর খারাপ! মাথা ধরেছে কি? জলপট্টি বেঁধে দেব? য়্যাস্‌পিরীন আন্‌ব? স্নান ক'রে নেবে?—না যাই, পাখাটা নিয়ে আসি গে।

ফিরিয়া আসিয়া হাওয়ার চোটে চাদর ও রুমাল উড়াইয়া দিয়া অভিমানের সুরে কহিল,—কে বলেছিল তোমায় অসুখ

নিয়ে আস্‌তে? আমার পোড়া কপাল! নইলে এমন হবে কেন?

অভিমানে অভিমান আনে, তাই এতক্ষণে উত্তর দিলাম,—না গো না, তোমাদের কড়া তলবে আস্‌তে হ'ল। শরীর ভালই ছিল, মনে করেছিলুম এখানে কারুর অসুখ-বিসুখ হয়েছে। কিন্তু তোমরা ত দেখছি দিব্যি চলাফেরা কর্‌ছ! অসুখের অজুহাতে এক মাসের ছুটি নিয়ে এলুম, তা কারুর অসুখ-বিসুখ না থাকলে আমাকেই অসুস্থ হ'য়ে পড়তে হবে! না-হয় শীঘ্‌ঘীর শীঘ্‌ঘীর ফিরে যেতে হ'বে।—তোমার বাবা ত হুকুম করেছেন।

—কেন, লোকে কি শুধু গাধার মত খাটবেই বার মাস? বেড়াতে নেই, আমোদ-প্রমোদ নেই? এ কী রকম? নাঃ, তোমাকে একটি মাস থেকে যেতেই হবে। তুমি বাবার জন্যে ভেব না।

বলিলাম,—তা হলে এক কাজ করি। হোটেলে গিয়ে থাকব আর লুকিয়ে লুকিয়ে তোমায় দেখে যাব! রাত্রে দরজা খোলা রাখবে—

—হুঁ,—চোর বলে-মার খাবার ইচ্ছে বুঝি!

হঠাৎ রাগিয়া বলিলাম,—তোমার বাবার সাধ্যি হবে দারোগার গায়ে হাত তুলতে? সে দেখে নেব একবার। তবে ঐ যে! পাড়ার লোকেরা জড় হয়ে উপহাস করতে পারে বৈ কি! ওঃ প্রাণটা ফস্কে গেল—

—বাঃ রে ! তোমায় না বললুম—চিন্তে করো না। সে আমি দেখব।—

ক্ষণিকের জন্য আশ্বস্ত হইয়া প্রিয়তমার অনভ্যর্থনার ক্ষতি-পূরণ করিলাম। খাওয়া-দাওয়ার পরে দুপুরটা এক রকম ভালই কাটিল।

শ্বশুর-মহাশয়ের প্রত্যাবর্ত্তনের সময় হইয়াছে ঘোষণা করার অপরাধে রজনীকে তিরস্কার করিয়া উঠিলাম। আবার দুর্ভাবনা আসিয়া জুটিল। তাঁহার সহিত পূর্ব্বে এত আলাপের সুযোগ হয় নাই, এবার তাঁর বৈষয়িক বুদ্ধির যে বহর দেখিলাম তাহাতে সমস্যা জটিল বলিয়াই মনে হইল। তবে মণিমালার আশ্বাস ?—সে ত নিতান্ত মেয়েমানুষ ! জজ-সাহেবের সেরেজদার ও থানার দারোগার মধ্যকার ব্যাপারে তার হাত আর কত দূর থাকিতে পারে ?

নির্জ্জনে অশ্রুপাত করিলাম। দয়াময়কে স্মরণ করিলাম—কয়েকটা দিন যদি শ্বশুরের অন্ন কপালে জোটে !

৬

শ্বশুর-মহাশয় পাশের ঘরে ঢুকিয়া কাপড় ছাড়িতে ছাড়িতে শাশুড়ী-মাতাকে বলিলেন,—মণোর মা, ও মণোর মা ! দেখ, জামাই মাত্র দু দিনই এখানে আছে—খাওয়া-দাওয়ার বন্দোবস্ত যেন একটু ভালই হয়।

আমি মনে মনে বলিলাম,—তার বদলে একটু বিষ খাইয়ে দিন না কেন?

চটীজুতা পায়ে দিয়া চট-চট করিয়া এ-ধারে আসিয়া বলিলেন,—হ্যাঁ, এখন ত বেশ লাগছে? চেহারা দেখেই ত বুঝতে পাচ্ছি। বেশ, চল একটু চা খেয়ে নিই গে।

সমস্ত শরীর তখন রাগে পুড়িয়া যাইতেছিল। দম বন্ধ করিয়া চক্ষু মুদিয়া সমস্ত মুখখানি জোরে বিকৃত করিয়া বলিলাম,—মোটেই নয়, মাফ করবেন। চা খাবার প্রবৃত্তি হচ্ছে না। খাবই না।

অনেক পীড়াপীড়ি করিয়াও হারিয়া গিয়া শেষে চায়ের দোষকীর্ত্তন করিয়া বলিলেন, চা খাই বলেই যে ওটার প্রশংসা করব তা নয়। ওটার দোষ রয়েছে অনেক। বেশ, নাই খেলে এবেলা। রাত্রে একটু দুধ-রুটীর বন্দোবস্ত দেখা যাবে। কাল সকালে নিশ্চয় দেখবে দিব্যি সেরে গেছে। যদি না-যায় তবে—মণোর মা, ও মণোর মা!—বক্তৃতা আর ভাল লাগিল না, তাই তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া পড়িলাম।

সন্ধ্যার পরে খাওয়া-দাওয়ায় একটু বিরক্তিই দেখাইলাম। মণিমালার আদরযত্নে রাত্রিটা কোনমতে ভালই কাটিল।

৭

পরদিন সকালে বাহিরে আসিয়া হাত-মুখ ধুইতেছি এমন সময়ে রজনী ছুটিয়া আসিয়া,—বাবু, বা—বু, দিদি

দি—দি যেন কেমন কেমন কচ্ছে গো—বলিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

ধমক দিয়া বলিলাম,—হারামজাদা, ন্যাকামী কর্‌ছিস্—বল্ না কি হয়েছে।

—দিদি, ও গো আমার মণি দি—দি, চোক মুখ বুজে কেবল মেজেতে গড়াচ্ছেন। কথাও কন না, জবাবও দেন না, বাবা মা ত এখনও শুয়েই রয়েছেন।

সময় অতি সঙ্কীর্ণ, তাই আর জেরা করিলাম না। মনে করিলাম, শেষে অতি প্রিয়জনকেই অসুখে ধরিল বাড়ীতে এত লোক থাকিতে? বলিলাম, আমি যাচ্ছি, তোর বাবা মাকে চট্ ক'রে খবর দে!

বিছানার পাশে সকলের জড়ো হইতে আর বেশী দেরী হইল না। কেহ বলিল মূর্চ্ছা গেছে, কেহ বলিল মৃগী, কেহ সোনার চাঁদকে রাহুতে ধরেছে বলিয়া কতকটা কাঁদিয়াই ফেলিল।

আমার শুধু দুঃখ হইল, এ-বাড়ীতে এত লোক থাকিতে আমার কেবল আর এক দিনেরই সঙ্গিনীকে ভূতে ধরিল!

—ভাল শরীরে হঠাৎ মূর্চ্ছা গেলে তাকে ভূতে-ধরা ছাড়া আর কিই বলিব—বলিয়া আক্ষেপের সহিত মন্তব্য প্রকাশ করিলাম।

শ্বশুর-মহাশয় তখন আসিয়া পড়িয়াছেন। সকলের মুখের

দিকে তাকাইয়া আমাকেই উদ্দেশ করিয়া মাথা নাড়িয়া কহিলেন,—ভূতে যদি ধরেই থাকে, তা হ'লে বাবা, তুমিই গোয়ালদিঘী থেকে ভূত সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসেছ। কি বল তুমি, মণোর মা? এ বাড়ীতে ত আর কখনও এ-বালাই এসে জোটে নি। এখন ওঝা ডাকাই, না ডাক্তার?

বিরক্তি চাপিয়া গম্ভীর গলায় বলিলাম, ভাল ডাক্তার—আর যদি পাওয়া যায় তবে লেডী ডাক্তার ডাকাইয়া রোগ নির্ণয় করাই ভাল।

—আ-রে বলেছ ভাল। ঐ প্রিয় ডাক্তার আর তার ঐ মোটা বৌটি—দু-জনেই একসঙ্গে রোগী দেখে বেড়ায়। যাও না বাবা রজনীকে সঙ্গে ক'রে—একবার তাদেরে নিয়ে এস দৌড়ে। আমি নিজেই যেতাম, কিন্তু তারা রোগীর সম্বন্ধে আগেই যত খুঁটিনাটি প্রশ্ন করেন, 'জেরা' করেন, তার উত্তর তুমিই দিতে পারবে বেশী। কি বল, মণোর মা?

প্রিয় ডাক্তার বারান্দায় বসিয়া আনমনে কি একটা কাগজ পড়িতেছিলেন। আমি সিঁড়ির তলায় পৌঁছিতেই ঘরের দিকে মুখ ফিরাইয়া চাপা গলায় বলিলেন,—ও গো কাপড় ছেড় না। দেখি কল্ এসেছে বলেই মনে হচ্ছে।

আমার দিকে চাহিয়া হাসিমুখে শুধাইলেন,—কি ব্যাপার বলুন! আমি ঠিক ধরেছি,—ডেলিভারী কেস্; বটে ত?

তা হাতে অনেক কাজ, অবসর বড্ড কম! চট্ ক'রে ব'লে ফেলুন ত—কী রকম অবস্থা।

—এসেছি যখন, তখন বলব বৈকি? শুনেছি আপনারা ত অল্পে ছাড়েন না, 'জেরা' ক'রে দস্তুরমত নাড়ীর খবর নিয়ে নেন। তা আপনার স্ত্রীকে একটু ব'লে রাখুন তাঁকেও যেতে হবে।

—ও আমার বলাই আছে। এই দেখুন—আমাকে কেউ একলা ডাকে না, মনে হয় যেন আমার স্ত্রীর উপরেই লোকের চোখ বেশী—বলিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া ফেলিলেন।

আমি যতটা জানি বলিলাম।

ডাক্তার ও ডাক্তারণী উভয়কে সঙ্গে লইয়া আসিলাম। বলিলাম,—উনিই অনুগ্রহ ক'রে ভিতরে গিয়ে দেখে আসুন। আপনাকে বললেই হবে, আপনি এখানে বসুন।

প্রিয়বাবু হাসিয়াই সারা। বলিলেন—তা বেশ, তবে আমার যে বয়স তাতে ক'রে আপনার স্ত্রীকে আমার মা ব'লে ডাকবার অধিকারই ত রয়েছে। আচ্ছা, দেখা-শুনাটা উনিই না-হয় করুন।

প্রায় আধঘণ্টাকাল দেখিয়া শুনিয়া আসিয়া ডাক্তারণী হিসাব দিলেন। নাড়ীর গতি দ্রুত, কিন্তু অস্বাভাবিক নয়; ফুসফুস নির্দ্দোষ! রোগিণীর কথাবার্ত্তা ফিরিয়া আসিয়াছে,

তবে কথা বড্ড কম কহিতেছে। তালিকা দিয়া বলিলেন—আমি ত বাহ্যতঃ কোন ব্যারামই ধরতে পারছি নে!

শ্বশুর-মহাশয় এতক্ষণ চুপ করিয়াই ছিলেন, লাফাইয়া বলিলেন,—তা হ'লে বুঝেছি—ওঝারই দরকার হবে! তবে রজনী—কি বল মণোর মা?

প্রিয়বাবু বাধা দিয়া বলিলেন,—থামুন, ওঝা-ফোঝার দিন চলে গিয়েছে। নিজের স্ত্রীর প্রতি চাহিয়া বলিলেন—হ্যাঁ, কি ক'রে ধরতে পারবে বল? তুমি ত আর রোগের পূর্ব্বকার ইতিহাসটা শোন নি। আমি ঠিক ধরেছি। ঐ যে সেদিন তোমাকে বললুম না, আজকাল আবার একটা নূতন রোগ দেখা দিয়েছে,—যাকে বলে, 'লাভ-ষ্ট্রোক্'। এক্ষুনি প্রেস্ক্রিপ্‌শন ক'রে দিচ্ছি। দিন ত এক টুকরো কাগজ।

কাগজ লইয়া ইংরেজীতে লিখিলেন,—"একুয়া পির্ডরা ইন্ বোটল্ ডি লিউক্"—"সেগু ওয়ান্ য়্যাট্ ওয়ান্স"—বলিলেন, শীঘঘীর একটি লোক পাঠিয়ে দিন ত ওষুধটা নিয়ে আস্‌তে। আমার ডিস্পেন্সারী ছাড়া অন্য কোথাও মিলবে না।

ঔষধ আনিতে দিয়া প্রিয়বাবু সবাইকে উদ্দেশ করিয়া বক্তৃতা ঝাড়িলেন,—ব্যারাম এটা নূতন হ'লেও—আসলে কিন্তু নূতন নয়। তবে এর প্রগতি ও প্রতিবিধানের ব্যবস্থা

এত দিন জানা ছিল না। পূর্ব্বে ভূতে ধরেছে বলেই লোকের বিশ্বাস ছিল। ভূত কিন্তু "মনের বাঘ"-এর মত একটি ভিত্তিহীন কুসংস্কার মাত্র। এটাকে বহু গবেষণা ও রিসার্চ্চ ক'রে আমি ধরতে পেরেছি। এটার নূতন নাম 'লাভ ষ্ট্রোক্'। যুবক-যুবতীদের মধ্যেই এর প্রকোপ বেশী। এর মেডিক্যাল কজেস্ বা বৈজ্ঞানিক কারণ বিশেষ কিছু নয়। আশা ও নিরাশা ওদের Nervous system বা স্নায়ুমণ্ডলে এক রকম gaseous vapour বা ধুঁয়ার মত বাষ্প তৈরী ক'রে দেয়। পরস্পরের আশু অমঙ্গল সংবাদ, হঠাৎ বিরহ-ভয় বা ব্যবহারজনিত পীড়া—এই সব কারণের কোন একটিই হঠাৎ ঐ গ্যাসে আগুন ধরিয়ে দেয় এবং সঙ্গে সঙ্গে সিষ্টেমে ভীষণ firing আরম্ভ হয়ে যায়। তখনই সংজ্ঞালোপ, পাক খাওয়া ইত্যাদি সিম্‌টম্ দেখা দেয়। কেস প্রায়ই ফেটাল্ হয় না, তবে ব্রেন ও হার্ট য়্যাফেক্ট ক'রে বাল সাবধান হ'তে হয়।

শ্বশুর মহাশয় মনোযোগ দিয়া শুনিয়া যাইতেছিলেন, এবারে বাধা দিয়া তর্কের অবতারণা করিলেন। বলিলেন,—ব্যারাম ত নূতন কতই দেখা দিয়েছে।—এই ধরুন না, কালাজ্বর, ডেঙ্গু, ওয়ারফিভার, ইত্যাদি। এটা না হয় বিশ্বাস করেই নিলুম, 'লাভষ্ট্রোক' বা সে-রকম একটা। কিন্তু ডাক্তার-মশাই, কারণগুলি যা দিলেন তাতে ত ঠিক একমত হ'তে

পারছি নে—আপনার স্ত্রীকেই জিজ্ঞেস করছি—ধরুন না ও-সব কারণ ত আমাদের জীবনে কতই ঘটেছে। —"স্ত্রীর ভয়ানক অসুখ" ব'লে 'তার' পেয়েছি, দুঃখ হয়েছে, ছুটে গিয়েছি ; —বিরহ ত সামান্য কথা, কত বিচ্ছেদ পর্য্যন্ত ঘটেছে, সব সাম্‌লে গিয়েছি। আর কলহ-বিবাদ ত স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে অহরহ হবেই, হওয়াই উচিত—তাতে ক'রে আমার ত দূরের কথা, আমার স্ত্রীরও ত কখনও সংজ্ঞালোপ বা রোগটোগ হয় নি! কি বল মণোর মা? যাক্,—আপনার হাতে যখন কেস্ গিয়েছে তখন নিশ্চিন্তই হওয়া গেল। জামাই বাবু তাহ'লে কালই বাসায় ফিরতে পারেন—ওর নূতন চার্জ্জ! সেবা-শুশ্রূষা ত মা-বাপ হিসেবে আমাদের করতেই হবে।—কি বলেন ডাক্তার বাবু?

আমার গায়ের রক্ত আবার ফুটিয়া উঠিল, মনে হইল তখনই ছুটিয়া গিয়া ষ্টীমার ধরিয়া ফেলি!

প্রিয়বাবু বৃদ্ধের দিকে অঙ্গুলি-সঞ্চালন করিয়া ঝঙ্কার দিয়া বলিলেন,—আপনার মতামতে আস্‌বেই কি আর যাবেই বা কি? চিকিৎসাশাস্ত্রের আপনি জানেনই বা কি? এ রোগের আনুষঙ্গিক ব্যবস্থাই বেশী দরকার। ওঁকে দু চার দিন এখানে থাক্‌তেই হবে এবং—এই যে ওষুধটা এসে পড়ল—এটি আমার নিজের তৈরি, মনে করেছি পেটেণ্ট ক'রে ফেলব। নূতন আবিষ্কার হিসেবে দাম খুব কমই

রেখেছি—মাত্র ৩৷৹ টাকা। ভাবলাম গরীব বাঙালীদের দিকে কেউ তাকিয়েও দেখে না। দাম কম না রাখলে তারা যে মারা যাবে! আহা বেচারারা ত কুইনাইনের পয়সাই যোগাতে পারে না।—তা নিন এক ডোজ এক্ষুনি খাইয়ে দিন, তার পর তিন-তিন ঘণ্টা পর এক ডোজ!—চার-পাঁচ শিশি খাওয়াতে হবে—ভয় কিছুই নেই—তবে এখন উঠি।

শ্বশুর-মহাশয় প্রচণ্ড বাধা পাইয়াই হউক বা ঔষধের দাম শুনিয়াই হউক স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। প্রিয়বাবু সস্ত্রীক উঠিয়া পড়িলেন, অথচ ভিজিটের কোনই ব্যবস্থা হইল না দেখিয়া অগত্যা আমিই পকেট হইতে ৩৷৹ আর ৫৲ মোট ৮৷৹ টাকা বাহির করিয়া দিলাম।

তাঁহারা বিদায় হইলে শ্বশুর-মহাশয় কৃত্রিম হাসির ভান করিয়া বলিলেন—দিয়ে দিয়েছ? বেশ করেছে? তা হিসেব রেখ এখন। সবটা তোমায় দিতে হবে না, অর্দ্ধেকটা আমরাই দিয়ে দেব। স্বামী ও বাবা হিসেবে তোমার ও আমার উপর মণিমালার সমান দাবী। যাও, এখন ভাববার কিছু নেই, ওষুধটা একটু খাইয়ে দাও গে! মণোর মা, ও মণোর মা!—তিনি মণিমালার মাতাকে ডাকিয়া লইয়া প্রস্থান করিলেন।

৮

ঔষধ খাওয়ান আমার একটি প্রধান কর্ত্তব্য হইল। তিন-চার দিন অন্তর ডাক্তারেরা আসিয়া দেখিয়া যাইতে লাগিলেন এবং একই ঔষধের পুনর্ব্যবস্থা করিয়া দিয়া মণিমালার মনস্তুষ্টিসাধন—অনুপান বা আনুষঙ্গিক ব্যবস্থাস্বরূপ—আমাকেই করিতে হইবে পুনঃ পুনঃ আদেশ দিয়া যাইতেন।

মণিমালা বলিল—শরীর ত আমার একটু অসুস্থ হয়েই ছিল, কিন্তু তা ব'লে তুমি চিকিৎসার ঘটা ক'রে এত টাকা উড়োবে নাকি? যাও, আমি ভাল হ'য়ে গিয়েছি।

আমি বলিলাম,—তুমি বল্‌লে ত হবে না! তোমাকে ডাক্তারী আইনের চক্ষে সেরে উঠতে হবে। টাকা ত ভারী জিনিষ, তোমার নিকটে থাকতে পারছি, এর মূল্য কি কম?

সময়টা বেশ কাটিয়া যাইতেছিল। তেইশ-চব্বিশ দিন পরে ডাক্তারবাবু লিখিয়া পাঠাইলেন, তাঁহাদের আর আসিতে হইবে না। ঔষধটি মাঝে মাঝে এক ডোজ দিলেই হইবে।

এবার নিজেই শ্বশুর-মহাশয়ের সমীপে প্রস্তাব করিলাম,—ভগবানের ইচ্ছায় মণিমালার শরীর ত বেশ ভালই হয়ে গেছে। এবার যাত্রার উদ্যোগ করি?

—হ্যাঁ যাবে বইকি? মণোর মা, মণোর মা, দেখ ত এদিক,—অ্যাঁ বাবা, তুমি মোট কত টাকা ব্যয় করেছ? ৫২৲ টাকা?—হ্যাঁ, মণির মা, দেখ ত অনিলের ছাব্বিশটী টাকা

দেওয়া যায় কি না ? না হয়ত আসছে মাসের মাইনে পেলেই পাঠিয়ে দেওয়া যাবে। ওর হাতে টাকাও যা আমার হাতেও তা।

—কেন দেওয়া যাবে না ? এই আমি এখনই দিয়ে দিচ্ছি,—বলিয়া শ্বশ্রূমাতা উদারতার পরকাষ্ঠা দেখাইলেন।

৯

মাসের শেষে বিদায় লইতে গিয়া মণিমালার ছল ছল চোখ দুটি দেখিয়া মনে বড় ব্যথা পাইলাম। হাতখানি বুকে টানিয়া লইয়া বলিলাম,—প্রিয়তমে, কেন ? তুমি ত তোমার কথা রেখেছই,—একটি মাস বেশ কেটে গেল। এখন আসি ! তোমার বুদ্ধিতেই ত একটা মাস থেকে যেতে পারলাম।"

—হ্যাঁ, আস্‌বে বইকি ? একটি মাস বইত নয় ?—আচ্ছা, কথা দাও,—যত দিন তোমার ওখানে বাসা তৈরী না হয়, তার মধ্যে আর অন্ততঃ একবার এসে বেড়িয়ে যাবে। বল, কথা দাও !

হঠাৎ শ্বশুর মহাশয়ের অভিমত ও হাবভাব মনে পড়িয়া গেল ; রাগিয়া উঠিয়া বলিলাম,—কথা দিতুম বইকি ? কিন্তু তোমার বাবা ত ভুলেও আব খরচ পাঠাবেন না, আর এমনি এলে অভ্যর্থনা যে কেমন করবেন তা'ত দেখলেই।

ব্যথিত সুরে মণিমালা কানের কাছে মুখটি আনিয়া বলিল—তবে সে সময়ও আস্‌বে না ?

শ্বশ্রূমাতার নিকট বিদায় লইয়া আসিয়া এবার শ্বশুর-মহাশয়ের সমীপে উপস্থিত হইলাম। তিনি খড়ম পায়ে দিয়া তাঁহার ঘরের মধ্যে পাইচারি করিতেছিলেন, বোধ করি আমি অবশেষে বিদায়ই লইতেছি সেই সুখে! আমি প্রণাম করিলাম। তিনি হাসিয়া বলিলেন,—বেঁচে থাক বাবা, সুখে থাক,—ধন, গৌরব দুই-ই তোমার হউক,—হ্যাঁ, বাবা বুড়ো মানুষের কথাটা মনে রেখ—এ বয়স খাটবার আর উপার্জ্জনের। একনিষ্ঠ হ'য়ে এবার কাজে লাগবে।—আর তোমায় আমরাও বিরক্ত করছি না—

—আজ্ঞে, হাঁ, আর শীঘগীর ছুটিও মিলবে না! তবে—

—তা চিঠিপত্রে খোঁজখবর নেবে ও দেবে। এখান থেকে বেশী দূরও ত নয়?

—না ভাবছি কি—তবে, মণিমালার ডেলিভারির সময়টায় একটু বিশেষ যত্ন নেবেন। ঐ ডাক্তারই ওর স্ত্রীকে নিয়ে এসে দেখে যাবেন। আমি ওখান থেকে খোঁজ নেব।

শ্বশুর মহাশয় চমকিয়া—না, না, বসো, একটু ভেবে দেখছি—বলিয়া খানিকক্ষণ চোখ মুদিয়া রহিলেন, বলিলেন—না, তবে বাবা, তুমিই এসে প'ড়ো। ব্যাপারটা ত কিছুই নয়। তবে কি জান? ভয় করি ঐ রোগ-টোগের। আবার দেখলে ত? প্রিয়বাবুর পেটেন্ট ওষুধগুলির দাম? তা বাবা, তুমিই ও-সব রাখবে ভাল! ভেব না, অর্দ্ধেক খরচ ত আমিই দেব।

বোঝাপড়াটা কেবল ঐ ডাক্তারের সঙ্গে, তুমিই না-হয় সবটা ক'রো। মনে থাকে যেন আবার এ'সো।

—আজ্ঞে, তবে আসাই যাবে। এখন আসি।

—আচ্ছা বাবা, এস. রজনী ও রজনী, মণোর মা, ও মণোর মা! আমার জামাটা আর ছাতাটা?—ষ্টেশনে ওকে দিয়ে আসি।

ষ্টীমার বাঁশি দিয়া ছাড়িয়া দিল। শ্বশুর-মহাশয় তখনও পাড়ে দাঁড়াইয়া রুমাল ঘুরাইয়া বলিতে লাগিলেন—মনে থাকে যেন। আবার ছুটি নিয়ে এ'স গো—এ'সো······

———

মেমো অফ্ থ্যাঙ্কস্ *

(Memo of Thanks)

১

যুবক রবীন্দ্র বিলাতে আসিয়াছে মাত্র কয়েক দিন। পাশ্চাত্যের মোহ তাহার কখনও ছিল না। স্বদেশ প্রেমে সে ছাত্রজীবন হইতেই মজিয়াছিল। জালিয়ানওয়ালাবাগের ব্যাপারেই সে কলেজ হইতে চিরবিদায় লইয়া বসিত কিন্তু পেন্সনভোগী পিতার জন্য তাহা পারিয়া উঠে নাই। না পারায় তাহার রোষ ও ক্ষোভ সাময়িক পত্রিকার পিঠেই জ্বালাময় প্রবন্ধ ও কবিতার আকার ধারণ করিয়া প্রশমিত হইত।

তাহার পিতা অবসর-প্রাপ্ত জজ্। পিতার মনে আশা আকাঙ্ক্ষার অবধি ছিল না। চাকুরীর মোহ তাঁহাকে পাইয়া বসিয়াছিল! পুত্র রবীন্দ্র স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের সমান খ্যাতি লাভ করুক এমন কথাও তিনি কানে লইতেন না; বলিতেন—তা'হলে কলেজে পড়বার দরকার ছিল কী? এদেশে তা'হলে সিভিলিয়ান হবে কা রা? সাদা—কালোয় বাধ ভাংবে ক বে?

* অমৃতবাজার—১৯৩৮। (ইংরেজীতে প্রকাশিত। এখানে পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত।)

রবীন্দ্রনাথের জ্বালাময় প্রবন্ধ বা কবিতা দেখিলেই বাবা চটিয়া যাইতেন, শিহরিয়া উঠিতেন—পুলিশের দপ্তরে না জানি তাঁহার ছেলের কালিমাছাপ থাকিয়া যায়! ধমক খাইয়া ছেলের কবিত্বের সাধ দমিয়া যাইত—ভাবিত,—হায়! কতদিন আর পিতার মতে মতে সায় দিয়া চলিতে হইবে!

জাহাজে পা দিয়াই রবীন্দ্র হাঁফ ছাড়িল। সংযত ব্যক্তিত্ব এবার স্বাধীনতার উন্মুক্ত হাওয়ায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। যুক্তকরে বাবার উদ্দেশে প্রণাম ঠুকিয়া মনে মনে বলিল,—বাবা, তোমার অর্থের ঋণ হয়ত শোধ করতে পারব না, তবে দাসত্ববোধের প্রায়শ্চিত্ত আমার করতেই হবে।

বোম্বাই সহর অদৃশ্য হইয়া আসিতেছিল! ভারতমাতার উদ্দেশে তাই ভক্তিনিবেদন করিল,—"রেখো, মা, দাসেরে মনে, এ মিনতি করি পদে……"।

২

বিধবা মিসেস সেমিজের নীচের তলাটা ভাড়া লইবার পূর্ব্বে রবীন্দ্র বোঝাপড়া করিয়া তাঁহাকে তাক লাগাইয়া দিয়াছে। টাকা পয়সা সে বেশী দিবে কিন্তু সে যে ভাবে ইচ্ছা থাকিবে, যখন ইচ্ছা আসিবে, যাইবে এবং যাহাকে খুশী আনিবে, রাখিবে ইত্যাদি!

মিসেস তাহাকে বিদ্রূপ করিয়াছেন—আপনি যেন দেখছি ভারতের ভবিষ্যৎ ভাগ্য নিয়ন্ত্রণে লেগে গেছেন!—আমি রাজী!

চুক্তির প্রথম পর্ব্ব দেখা দিল রবীন্দ্রের পাকপ্রণালীর ভিতর দিয়া। ষ্টোভের শব্দে চারিদিক মুখরিত। আলুর খোসায় ঘরের মেজ পরিপূর্ণ। কী স্যাতস্যাতে ব্যাপার!

মিসেস সেমিজ শুধু এই মাত্র নিবেদন করিলেন;—একটা সাইলেন্সার (silencer) ব্যবহার করলে হয় না, মিঃ সেন!

রবীন্দ্র চুক্তিপত্রের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া দৃঢ়স্বরে বলিল,—এটা আমা—র খুশী, মিসেস সেমিজ—ইচ্ছা হ'লে আমি একটা এ্যাম্প্লিফায়ার (amplifier) ব্যবহার করব!

মিসেস সেমিজ অপ্রতিভ হইলেন। হন্ হন্ করিয়া সিঁড়ি বাহিয়া নিজের ঘরে গিয়া দরজার পাট জোরে ধাক্কা দিয়া বন্ধ করিলেন, চেয়ার টেবিলের উপর অযথা রাগ ঝাড়িলেন—তারপর বারান্দায় আসিয়া রবীন্দ্রের ঘরের দিকে চাহিয়া তাহাকে উদ্দেশ করিয়া আপন মনে বলিলেন,—তবে রে ছোক্‌রা—বিলেতে এসেছিস্ কেন? বাড়ী থেকে দেশোদ্ধার করলেই পারতিস্!

রবীন্দ্র শুনিল না। ষ্টোভে দুইচারিবার পাম্প করিয়া মাখন গলাইয়া ঘি ফুটাইল, ফুটন্ত ঘিয়ে কুচি কুচি আলু ফেলিতেই ঝাঁৎ করিয়া যে শব্দ হইল তাহার তালে তাল মিশাইয়া বলিল—তবে রে বুড়ী, তোর রূপগুণ থাকলে আর বিধবা থেকে যেতিস্ নে। তোর মত বাড়ীউলী অনে—ক দেখেছি।

সামান্য কারণে দুই দিকের এতটা বাড়াবাড়ি বিসদৃশ্য ঠেকিলেও মনে রাখিতে হইবে, ব্যক্তিস্বাধীনতার যুগে সংঘর্ষ অনিবার্য্য।

৩

রবীন্দ্র নিজের ঘর সাজাইতে দুই চারি দিন লাগাইয়া দিয়াছে। গাদা গাদা বাধান মডার্ণ রিভিউ, ভারতবর্ষ, প্রবাসী ইত্যাদি মাসিক পত্রিকা; নবীন সেন, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের গাদা গাদা বই; ধুতি, চাদর, পাঞ্জাবী ভরা ট্রাঙ্ক, আবার বাবার দেওয়া কোট প্যাণ্ট এ সমস্ত কোথায় কোনটা রাখিলে ভাল হয় চিন্তা করে আবার পাল্টায়। বোধ হয় ঠিকভাবে সাজাইতে তার আরও কয়েকদিন কাটিয়া যাইত কিন্তু তাহার বন্ধু সুবোধ আসিয়া সুবিধা করিয়া দিল।

—হ্যারে, তুই বেরুস নি ?

না:—

কেনরে ?

ঘরটা সাজিয়ে নিলুম।

দেখি কি করেছিস ?

সুবোধ উঠিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিয়া ধপাস করিয়া বসিয়া পড়িল; বলিল,—হুঁ, এত ঘটা করে বাংলা দেশ থেকে গাদা গাদা বাংলা বই এনেছিস্ কেনরে? কি কাজে লাগবে এখানে ?

কেন ? পড়ব।

ব্রিটিশ মিউজিয়াম লাইব্রেরীতে এত বই রয়েছে যে দেখে তোর তাক লেগে যাবে।

যাবে ? তা দেখব।

বেরুবি ?

হ্যা—।

কোথায় ?

ব্রিটিশ মিউজিয়মে !

সে ত হবে। লোকজনের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করবি নে ?

প্রয়োজন ?

আলাপ আলোচনা !

ওঃ, সে হবে'খন, কাঁরা কাঁরা আছেন ?

সুবোধ একটী লিষ্ট বাহির করিল।—একে একে কল মেরে ফেল্। ওঁরাও তোকে দেখতে আসবেন। অনেক লোকজন রয়েছেন।

সুবোধ আবার জিজ্ঞাসা করিল—দেশের খবর ?

ভাল নয়।

কেন রে ?

অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়েছে। ধরপাকড়, হুড়াহুড়ি, গোলমাল চল্‌ছে।

রক্ষা আমরা এখানে। দিব্বি আছি ! গ্যাখ, দরকার হলে বে'থা' করে এখানেই থেকে যাব।

দেশের জন্য মমতা দেখছি খুব তোর? খুব সাহেব সেজেছিস যে?

হ্যা, তুই-ই দেশোদ্ধার করিস্। আমরা তোর গলায় মালা দোব। হ্যা যাক্। ওপরে কে রে?

মিসেস সেমিজ।

স্বামী কি করেন?

বিধবা, বাড়ীউলি।

বয়স?

মধ্যম।

দেখতে?

ভাল।

মেজাজ?

জবরদস্ত।

দেখিস কুরুক্ষেত্র বাঁধাস নে যেন।

দেখব।

সুবোধ উঠিল। তাহার বাহির হইবার সঙ্গে সঙ্গেই রবীন্দ্র কামরাটা আবার সাজাইয়া ফেলিল। বলা বাহুল্য, সুবোধ যাহা যাহা বলিয়াছিল তাহার ঠিক উল্টো!

৪

সাতদিন পর মিসেস্ সেমিজ পেন্সনভোগী হাইকোর্টের জজ্ প্রবাসী মিঃ গুপ্তের ওখানে আসিয়া দেখা দিলেন।

ইংরেজ মহিলা আসিলে মিঃ গুপ্টের সাজিয়া গুজিয়া বাহির হইতে অনেকক্ষন লাগিত।

—গুড্ মর্ণিং! মিস......(কার্ড দেখিয়া) মিসেস সেমিজ ......হাউ ডু ইউ ডু।

—হাউ ডু ইউ ডু মিঃ গুপ্টা—বহুদিন দেখাসাক্ষাৎ নেই।

কিছুক্ষণ আলাপের পর মিসেস সেমিজ কাজের কথা পাড়িলেন,—আপনার কাছে একটী কথা—

তা বেশ, বলুন—হাউ ক্যান আই হেল্প ইউ।

মিসেস্ সেমিজ আবেদন করিলেন, আমার ওখানে একটী বাঙ্গালী ছোকরা এসে জুটেছে—বড্ড জ্বালাতন করছে। কথা বললেই তেড়ে আসে। ম্যানারস্ যা' তা'!—বিরোধের বর্ণনা সারিয়া নিবেদন করিলেন,—আপনারা ইঙ্গবঙ্গ সমাজের নেতা; ওকে হাতে নিন না কেন? এমন করে চললে, ও ত এদেশে টিকতেই পারবে না।

—ওঃ তাই? সে ত একদিন না একদিন দেখা হবেই। নিশ্চয় দেখা যাবে। বোধ হয় মফঃস্বল থেকে এসে থাকবে—

—আমার মনে হয় নিছক পাড়াগাঁ থেকে—ওঃ আপনারা কি পলিস্ড! আর ও? আমার বড্ড ভয়-ই লেগে গেছে মিঃ গুপ্টা—বাড়ীভাড়া নিয়ে আবার চুক্তিপত্রও করে নিয়েছে—

—চুক্তিপত্র? বাঃ রে ছেলে! আচ্ছা দেখা যাবে'খন।

৫

সেইদিন সন্ধ্যাবেলায় মেয়ে মঞ্জুকে ডাকিয়া জজসাহেব কথা পাড়িলেন,—হ্যাখ মা, বাংলা দেশ থেকে এয়ার মেলে একখানা পত্র এসেছে ... ... আমার একজন সহকর্ম্মী পেন্সনভোগী জজ মিঃ আই, বি, সেন লিখেছেন, তাঁর ছেলে রবীন্দ্র বিলেতে এসেছে! ফিলসফিতে এম, এ, ব্যারিষ্টারী পড়বে আর সিভিল সার্ভিসেরও চেষ্টা দেখবে।—

তা বেশ, এক্সেলেণ্ট! তোমার বন্ধুর ছেলে? তা—এখানে না এসে যাবে কৈ? যত বেশী তত মজা—! এক্সেলেণ্ট!

—আরে আমার কিন্তু ভয় হচ্ছে মিসেস্ সেমিজের ভাড়াটীয়া ইনি-ই। যা শুনেছি তার বাবার পত্রে তারই প্রমাণ পেলুম। ছেলেটা নাকি বড্ড বে—আড়া ......

—বে ... ... কী?

—বে—আড়া—একটু উড়ি উড়ি ভাব, চঞ্চল, ঝগড়াটে, তা অমন কত ছেলেই ত থাকে? কি বল মা?

—হ্যা, মিসেস্ সেমিজ কি বললে?

সকালকার ঘটনাটা সমস্ত শুনিয়া মিস গুপ্টা হোঃ হোঃ করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল—মা, শুনেছেন?

—হ্যা, শুনেছেন বৈকি! তবে জজ সেনের ছেলে বলে জানেন না। ছেলেটা—একবার দেখা করতেও এল না?

অথচ তার বাবা লিখেছেন, আমায়ই ওকে দেখাশুনো করতে হবে ; পরের ছেলে ? কি বল মা ?

—বড্ড সুখবর বাবা, এক্সেলেণ্ট ! দেখা যাবে ভদ্রলোক কি ছাঁচের।—মা, মা শুনেছ ? বলিয়া হাসিতে হাসিতে মেয়ে মিসেস্ গুপ্টার কাছে সকল রিপোর্ট করিতে চলিয়া গেল।

৬

পরদিন মঞ্জু গুপ্টা টেলিফোন ধরিল—হ্যালো, হ্যালো, মিসেস সেমিজ ! গুড মর্ণিং।

—গুড মর্ণিং, আপনি ?

—জজ গুপ্টের মেয়ে,—কাল সকালে আপনিই এসেছিলেন ?

—হ্যাঃ।

—বাঙ্গালী ভদ্রলোকটী ঘরে আছেন ?

—হ্যাঃ ;

—ফোনে একটু ডেকে দিন না দয়া করে, বাবা কথা কইতে চাচ্ছেন।

—আচ্ছা !

—থ্যাঙ্ক ইউ। ... ...

—হ্যালো, আপনি মিঃ সেন ?

—হ্যা, আপনি ?

—গুড মর্ণিং, আমি জাষ্টিস্ গুপ্টের মেয়ে মঞ্জু গুপ্টা—

—গুড মর্ণিং, —তা আমায় ?

—হ্যা, বাবা আপনার সঙ্গে কথা কইতে চাচ্ছেন—একটু অপেক্ষা করবেন—

—হ্যা নিশ্চয়—

—থ্যাঙ্ক ইউ—

—হ্যালো, বাবা রবীন ?

—আজ্ঞে, হ্যা—নমস্কার—

—গুড্মর্ণিং, আমায় তুমি হয়ত—চেনই না, বা ভুলে গেছ—তোমার বাবা আমার সঙ্গে বহুকাল কাজ করেছেন—সে অনেকদিনের কথা—তিনি চিঠি লিখেছেন—তা তুমি ভাল আছ ?

—আজ্ঞে হ্যা—মন্দ নয়—এখনও সব গুছিয়ে সার্তে পারি নি—

—তা—একবার দেখা ক'রো এসে—এখানকার নম্বর ফিফ্টী সেভেন, রমফোর্ড, এসেক্স, ফোন নং নট্ নট্—ফাইভ ফোর সিক্স থ্রি, মনে রেখো—কথাবার্ত্তা হবে'খন। আবার শোন—নট্ নট্ ফাইভ ফোর সিক্স থ্রি—থ্যাঙ্ক ইউ—

—ধন্যবাদ।

—থ্যাঙ্ক ইউ, চিয়ারিওঃ ·· ···

৭

দুইদিন পরে মিঃ গুপ্টের ভবনে রবীন পদার্পন করিল।

মিসেস্ গুপ্টা দরজার ফাঁক দিয়া দেখিয়াই শ্বাস রোধ করিলেন—মাই গড্ কী—অদ্ভুত ছেলে !

মেয়ে মন্তব্য করিল—উঃ চুলগুলি দেখেছো? যেন সজারুর কাঁটা!

মিঃ গুপ্ট তাঁহার চাকুরী জীবনের অনেক কাহিনী শুনাইলেন, রবীন্দ্রকে হাসাইলেন, আশ্বাস দিলেন, সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলেন এবং পরিশেষে নিমন্ত্রণ করিলেন,—বাবা কাল সন্ধ্যায় ডিনারে আসবে! সবাইর সঙ্গে দেখা হবে—। বাহিরের ভদ্রলোকও ত্ব একটী আসতে পারেন, ডিনার স্যুট—রাত্রি ৯টা—ঠিক?

—আজ্ঞে, আস্‌বো, ধন্যবাদ!

—থ্যাঙ্ক ইউ, চিয়ারিও: :—

৮

পরদিন ডিনারের সময়ের পূর্ব্বেই রবীন্দ্র উপস্থিত। ড্রয়িং-রুমে বসিয়া পড়িয়া ঘরের লোকের অপেক্ষা করিতে লাগিল।

ড্রয়িংরুমের চেয়ারগুলো কিনারায় সরাইয়া মাঝখানটা খালি করা হইয়াছে। সিগার সিগারেট ও পানীয় পার্শ্বে একটী ছোট টেবিলে সাজানো।

বেয়ারার অন্দরে খবর দিল।

জজ সাহেব এস্তপদে ড্রয়িংরুমে ঢুকিতেই রবীন্দ্র উঠিয়া প্রণাম করিল, সাহেব চড়াগলায় হাসিয়া কাসিয়া বলিলেন,—এই যে বাবা, এসে পড়েছ, বেশ, তা কোন ট্যাক্সির শব্দ শুনলুম না—ত!

রবীন্দ্র—বাসে এসে নেমে একটু হেটেই এলুম।

—বেশ, বেশ, কৈ এঁরা এখনও বেরুচ্ছেন না—। বেয়ারার সালাম দাও।

মিসেস্ গুপ্টার আবির্ভাব! রবীন্দ্র উঠিল। প্রণাম করিল।

—বেঁচে থাক বাবা, তা—ভাল ত? কৈ মেয়েটার কি হল? বেয়ারার সালাম দাও।

—বেশ ভালই—

এবার মিস্ গুপ্টার আবির্ভাব! সে দরজাটা একটু ফাঁক করিয়া কে কোথায় দেখিয়া লইল। তারপর গুড ইভিনিং ড্যাডি, গুড ইভিনিং মামী, বলিয়া এক পা অগ্রসর হইল। বাবা মা উত্তর করিলে, রবীন্দ্রের দাঁড়াইবার পালা—। ইণ্ট্রোডিউস করিতে গিয়া—মিঃ গুপ্টা পরিচয় দিলেন।

—মেয়ে মঞ্জু—

—মিঃ রবীন্দ্রনাথ—

হাউ ডু ইউ ডু—

হাউ ডু ইউ ডু—

নরম হাতের ঝাঁকি খাইয়া রবীন্দ্র মুখ তুলিয়া দেখিতে পাইল, তাহার সমক্ষে ঘর উদ্ভাসিত করিয়া যেন একখানি মূর্ত্তিমতী আনন্দ!

মিস্ গুপ্টা এবার বিদ্যুতের মত ছুটাছুটি করিয়া সিগারেট লইয়া সাধাসাধি করিল; রং বেরং পানীয়ের দিকে দৃষ্টি

আকর্ষণ করিল কিন্তু রবীন্দ্র হাত জোড় করিয়া মাফ চাহিলে উভয়ে পাশাপাশি বসিয়া পড়িল।

কিছুক্ষণ আলাপের পর মটরের হর্ণ শোনা গেল।

—ঐ ওঁরা এসেছেন। এগিয়ে আনছি—বলিয়া জজসাহেব স্ত্রীর কানে কি বলিলেন, স্ত্রী আবার মেয়ের কানে কি বলিলেন, মেয়ে একটু দুষ্ট হাসি হাসিয়া রবীন্দ্রের কানে কানে বলিল—একটু ওঘরে চলুন না।

রবীন্দ্র—আমায় বলছেন? বেশ চলুন।

ড্রেসিং রুমে গিয়া প্রকাণ্ড আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া মিস্ গুপ্টা বলিলেন,—দেখুন, মানে—আপনার টাইটে বড্ড নীচে নেমে গেছে, উঠিয়ে দিচ্ছি—

—উঃ ধন্যবাদ—আমিই নিচ্ছি—বলিয়া রবীন্দ্র গলায় পেচানো কালো দড়ি উপরে উঠাইল।

—নাঃ— হল না, বেশী উপরে উঠে গেছে। আমিই ঠিক করে দিচ্ছি—বলিয়া মিস্ গুপ্টা নরম হাতের আঙ্গুলের সাহায্যে রবীন্দ্রের টাইটীর সঠিক প্রতিষ্ঠা করিয়া দিয়া হাসিল—দেখুন, এখন কি সুন্দর হল! এক্সেলেন্ট—খুব ভাল দেখাচ্ছে!

রবীন্দ্র অপ্রতিভ হইল। একটী যুবতী মেয়ের সঙ্গে একাকী! বেচারা অতি কষ্ট করিয়া হাসিল—

—উঃ, কষ্ট করলেন!

—কৈ ধন্যবাদ ত দিলেন না?

—ও ধন্যবাদ !

—মেনী থ্যাঙ্কস্ ইন রিটার্ণ !

রবীন্দ্র মন্তব্য করিল—আপনাদের বেশ—টাইফাইর কোন বালাই নেই। কী বিড়ম্বনা এগুলোতে !

মিস্ গুপ্টা হাসিল—হ্যা, তা—ব;ট—এখানে মেয়েরা স্বাধীনতা অর্জ্জন করছে, আর পুরুষেরা বর্জ্জন করছে—

রবীন্দ্র বলিল—হ্যা, তাই মনে হচ্ছে—সে টের পেয়েছি মিসেস্ সেমিজের ঘর ভাড়া নিয়েই।

মিস্ গুপ্টা তাহা জানে। হাসিয়া বলিল—বাইরে চলুন, অন্য লোকেরা এসেছেন······

ডিনারের প্রক্রিয়াগুলি শেষ করিতে অনেক সময় লাগিল। প্রথমে সুশৃঙ্খল আলাপ আলোচনা চলিল।

জজসাহেব বলেন—উঃ—ভারতের কী দৈন্য, কী দুর্দ্দশা, কী দারিদ্র্য, কি বল ডার্লিং ?

মেমসাহেব বলেন—তা'ত সত্যি ; কিন্তু তোমরা করছ কী? দৈন্য থাকলে চেষ্টা দেখতে হয় তা ঘুচাতে ? কি বল মা ?

মেয়ে বলে—তা আমরা ত আর দেশে নেই ; যাঁরা আছেন তাঁরা চেষ্টা করছেন বৈ কী ? কি বলেন মিসেস্ স্মীথ ?

মিসেস্ স্মীথ বলেন—কী জানি !—এতগুলো লোক

যেখানে, সেখানে না করা যায় কী! তবে নিশ্চেষ্ট উদাসীনতার কথা পৃথক। কি বল ডিয়ার?

মিঃ স্মীথ বলেন—তাই ত মনে হয়! ওদেশের লোকেরা যদি নির্জ্জীব না হয়ে সজীব হত, ভাগ্যের উপর দোষ না চাপিয়ে আত্মনির্ভরশীল হত!—কি বলেন, মিঃ রবীন?

রবীন্দ্রের পালা আসায় সে থতমত খাইয়া, কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া তারপর বলে,—বটেই ত, তা হলে কিন্তু এদেশের খুব সুবিধা হত না! পরাধীন দেশ......

—উঃ পলিটিক্স এনো না বাবা, ওঁরা রয়েছেন। কি বল ডার্লিং? বলিয়া জজসাহেব বাধা দেন। মেমসাহেব সমর্থন করেন; আবার আলোচনা ঘুরিতে থাকে।

সুশৃঙ্খল আলোচনার পর চলে এলোমেলো দৌড়! অর্থাৎ আগে কে বলিবে, কে কার কথা কাড়িয়া লইয়া প্রত্যুত্তর করিবে কার প্রস্তাবে কে সমর্থন আর কে বিরুদ্ধতা করিবে—তাহা লইয়া যেন বিষম কাড়াকাড়ি! ভীষণ প্রতিযোগিতা। গল্পগুজব হাসিতামাসা চলে আবার ঘুরে আসে ভারতের প্রসঙ্গ! ভারতের অশিক্ষা, কুশিক্ষা, কুসংস্কার···ইত্যাদি, ইত্যাদি।

জজসাহেব মন্তব্য করেন—এসব সোসিয়াল ব্যাপার। পলিটিক্সের সঙ্গে বিশেষ সম্বন্ধ নেই। কি বল···?

রবীন্দ্র অনেকক্ষণ শুনে! তাহার মনটা তিক্ত হইয়া উঠে। টিকিতে না পারিয়া অবশেষে সে বলিল—পলিটিক্সের কথা

বল্‌ছি নে! বিলেতে আসার সময় জাহাজে এক বিলেতি বন্ধুর সঙ্গে বেশ আলাপ জম্‌ল। মনে করলুম বেশ সময় কাটবে। কিন্তু······

মিস্ গুপ্তা কথা কাড়িয়া লইয়া বলিল—তা হ'ল না! নয়? কেন হ'ল না বলুন না মিঃ সেন?

জজসাহেব—ওঃ পলিটিক্স চর্চ্চা ক'রে বুঝি!—

রবীন্দ্র—না মোটেই নয়, একটী বাইওলজীর প্রশ্নে······

মিস গুপ্টা—বলুনই না শেষটায় কি হল।

রবীন্দ্র বলিল—সাহেবটা আমায় জিজ্ঞেস করে আপনার রং ত বিশেষ কাল নয়? আমি বললুম, আপনার রংও বেশ সাদা-শ্বেতকুষ্ঠ রোগীর মত—অবশ্য শেষ দুটি কথা তাকে শুনিয়ে বলি নি—সে আমায় বললে—দেখুন একটা কথা বুঝতে পারছি নে। আমরা ইউরোপে প্রায় সকলেই এক রং—তবে এই উনিশ কি বিশ!—আর আপনারা ভারতীয়েরা কেউ সাদা, কেউ কাল, কেউ মেটে, কেউ ঘোলাটে, এ সব কেন? যেন রামধনুর সকল রংই আপনারা ভাগাভাগি করে নিয়েছেন! আমি বললুম,—এটা আর কি শক্ত কথা? এই ধরুন, গাধা প্রায় সবগুলিই এক রং-এর কিন্তু ঘোড়া? ওদের রং বেরং দেখলে তাক লেগে যায়······

জজসাহেব মুখ ভারী করিলেন। মেমসাহেব অপর দিকে তাকাইলেন। মেয়ে হাসিয়া উঠিয়া হঠাৎ থামিয়া গেল। অন্য

দুইটী অতিথির মুখ কাল হইল। আর তপ্ত রবীন্দ্র যেন আত্মপ্রসাদ লাভ করিল।

ভারীমুখে ডিনার টেবিল হইতে সকলে ড্রইংরুমে প্রবেশ করিল। কিন্তু কিছুক্ষণেই আবার আমোদ জমিয়া উঠিল।

জজসাহেব মিসেস স্মীথের অনুগ্রহ ভিক্ষা করিতেই তিনি দাঁড়াইলেন। তারপর বুক টান করিয়া হাত দুখানা পাখার মত বিস্তার করিলেন। তারপর জজসাহেবকে জড়াইয়া রেকর্ড বাজিবার অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। রেকর্ড বাজিতে লাগিলে উভয়ে পায়ে পায়ে মেজের উপরে ত্রিভুজ চতুর্ভুজ ইত্যাদি অঙ্কন করিতে করিতে হেলিয়া দুলিয়া নাচিতে লাগিলেন।

মিঃ স্মীথ জজপত্নীর স্মরণাপন্ন হইলেন। তাঁহারাও লাগিয়া পড়িলেন।

রবীন্দ্রের দিকে তাকাইয়া মিস গুপ্টা চোখ টিপিল—রবীন্দ্র নড়িল না—নাচ শিখিতে তাহার বহু দেরী! অগত্যা তাহারা দুইজনে গল্পই করিতে লাগিল।

রবীন্দ্র বলিল—এঁরা আমাদের দেশে গিয়ে ওঁদের নাচ দেখান। আপনারা এদেশে কেন আমাদের দেশের নাচ দেখান না? এতটা কোলাকুলী জড়াজড়ি না থাকলেও ওতে বেশ আর্ট রয়েছে।

—ওঃ সে ত ষ্টেজে দেখাবার মত মিঃ সেন! বাড়ীতে ডিনারের পরে প্রাইভেট ভাবে নাচের যে প্রথাই এই।

রবীন্দ্র সন্তুষ্ট হইতে পারিল না। সে আরও অসন্তুষ্ট হইল যখন মিঃ স্মীথ বৃদ্ধাকে ছাড়িয়া কিশোরীর অনুগ্রহ ভিক্ষা করিয়া তাহাকে প্রায় ছিনাইয়া লইয়া যাইবার উপক্রম করিল।

মিস্ গুপ্টা মাফ চাহিল, বলিল,—থ্যাঙ্ক ইউ, তবে আজ থাক্, আজ আমি গল্পই করি—কিছু মনে করবেন না কিন্তু!

অনেক রাত্রে নিমন্ত্রিতেরা উঠিলেন—ওঃ ডিলাইটফুল ইভিনিং, পাস্ড্। থ্যাঙ্ক ইউ ভেরী মাচ্—

মিসেস্ গুপ্ট—ইট ওয়াজ সো কাইণ্ড অফ্ ইউ টু কাম্। থ্যাঙ্ক ইউ সো মাচ্—

রবীন্দ্র উঠিল—ধন্যবাদ!

মিঃ গুপ্ট—থ্যাঙ্ক ইউ, মাই বয়। মাঝে মাঝে এ'সো। তোমার বাবা আমার এত বড় বন্ধু ছিলেন। কি বল ডিয়ার?

মিসেস্ গুপ্টা—নিশ্চয় আসবে বাবা,—থ্যাঙ্ক ইউ টু হ্যাভ কাম দিস ইভিনিং। বড্ড আমোদ হল! না? কি বল মঞ্জু!

মিস্ গুপ্টা—ওঃ কী আমোদ! হাউ এক্সেলেণ্ট! নিশ্চয় আসবেন মিঃ সেন। বলুন আসবেন—

রবীন্দ্র—আস্ব, নিশ্চয় আসব।

মিস্ গুপ্টা—থ্যা—ঙ্ক ই—উ।

হস্তমর্দ্দনের পালার সর্ব্বশেষে মিস্ গুপ্টার হাতই রবীন্দ্রের কাছে খুব নরম, কোমল ও লোভনীয় মনে হইল।

৯

সে রাত্রে শুইয়া শুইয়া সবাই চিন্তা করিল—

জজসাহেব—তাইত ছেলেটি দেখছি বেজায় বে আড়া—

মেমসাহেব—উঃ কী বিশ্রী ধরণের কথাগুলো—

মিস্ গুপ্টা—মজার লোকটা বটে! তা স্বদেশের দিকে পক্ষপাতিত্বের দোষ! তা মন্দ কি?

রবীন্দ্র—বেশ মেয়েটি ত বটে! যেন আগুনের ফুলকী! বুড়ো বুড়ী গোল্লায় গেছে! উঃ কী জ্বালাতন! খালি থ্যাঙ্ক ইউ, থ্যাঙ্ক ইউ, আর থ্যাঙ্ক ইউ! মুখের ভাব এরা বেশ জানে! সাদা কালোয় বাধ ভাংতে অনেক দেরী—

সকলেরই অনেক রাত্রে ঘুম হইল।

১০

কয়দিন গেলেও আর যখন রবীন্দ্রের টিকিটিও কেহ দেখিতে পাইলেন না, তখন সকলেই নিরাশ হইলেন। সকালে গোলকামরায় বসিয়া জজসাহেব কথা পাড়িলেন—

—বেশ ছেলেটাত! আর খোজ খবর নেই—মনে করেছিলুম বোধ হয় মেয়েটার একটা সুপাত্রের সন্ধান পেলুম—কিন্তু এ যে জংলা ঘুঘু! কি বল ডিয়ার?—

মেমসাহেব—হ্যা, মাই গড্ কি অদ্ভুত?

সাহেব—তাইত—কী বে আড়া !

—কী মুখরা !

—কী ফাজিল !

এবার ইংরেজীতে বর্ণনা আরম্ভ হইল।

মেমসাহেব বলিলেন—হয়েছে ? হাউ ক্রেজী (crazy) ছেলেটা ! উঃ মেয়েও তেমন ! ওর কাছ দিয়েও এ ছেলে ঘেস্‌বে না। ঐ তোমায় বললুম না, সুশীল ছেলেটা আই, সী, এস, পাশ করে দেশে গ্যালো—বেশ মজেও উ:ঠছিল—হঠাৎ তোমার মেয়ে বলে কিনা—সুশীলদা তুমি ইংরেজী লিখতে পার কিন্তু বলতে পার না ; কি বিশ্রী তোমার উচ্চারণ ! শুনেই ছেলেটা পালাল। পালাবে না ? কি বল তুমি ?

সাহেব বলিলেন,—অহো, অত নরম ছেলেটা হাতছাড়া হয়ে গেল ! আর এটা ত একটা ক্র্যাক (crank) ! সুবোধ ছেলেটাও ত আর দেখা দিচ্ছে না ! ভাগ্‌ল ? কি বল তুমি ?

—জান না ও ছেলেটাও বেশ মজে গেছিল কিন্তু ঐ তোমার মেয়ে ? বলে কিনা,—তোমার সবই ভাল, সুবোধ বাবু, কিন্তু গলাটা একেবারেই খেত ! জান ? এ ছেলেকে ও ত পর্কুপাইন বলে ফেলবে—সেদিন দেখেই বলে ফেলেছে, —উঃ চুলগুলো কী রকম ! যেন সজারুর কাঁটা ! বল'ত তোমায় এমন কথা বললে তুমি আমায় ধরা দিতে ?—তা, কী হল ! এত বেলা হয়ে গেল—ও মঞ্জু, মঞ্জু ! উঠবি নে ?—

—এই ত মা আমি অনেকক্ষণ উঠেছি—বলিয়া মঞ্জুদেবী ড্রইং রুম আলোকিত করিল,—বাবা, বাবা! মিঃ সেনের ঠিকানাটা কি? চিঠি দিচ্ছি—আসবেন বলে গেলেন—কৈ আর ত এলেন না! ভদ্রলোকটা কী রকম! বড্ড কুইয়ার (queer)! নয়?

স্বামী স্ত্রী মুখ চাওয়া চাওয়ি করিলেন। বাবা বলিলেন, বেশ, তা লিখে দাও মা—ওর বাবা যখন ওর দেখাশুনো করতেই লিখেছেন—তা খোজখবর ত নিতেই হবে।......

১০

রবীন্দ্র চিঠি পাইল। দেখা করিতেও আসিল। আরও বহুবার আসিল, কারণ মঞ্জু তাহাকে পাকড়াও করিয়াছে। কিন্তু খুব জমিয়া উঠিতেছে না।

মঞ্জু জিজ্ঞাসা করে—তুমি তাহলে কী করবে মনে করেছ?

রবীন্দ্র উত্তর দেয়—কেন? ব্যারিষ্টারী পড়ব! গান্ধী, নেহরু; সি, আর, দাস—

—কেন? সিভিল সার্ভিস দোষ কি করলে?—আর, সি, ডাট, স্যার অতুল চাটুর্জ্জে—কে সি দে—

—হুঁ আমার মত—ব্যারিষ্টার—

—নাঃ আমার মত—সিভিলিয়ান—

—নাঃ ব্যারিষ্টার—

—নাঃ সিভিলিয়ান—

—ব্যারিষ্টার—

—সিভিলিয়ান—

—আপোষ রফা হয় না। উভয়ই উঠিয়া পড়ে।

১১

আবার দেখা হয়। রবীন্দ্র জিজ্ঞাসা করে—তুমি কি করবে মনে করেছ ?

—ডিগ্রী নেব।

—তারপর ?—

—বিয়ে করব—

—রাধতে পারবে ?

—ওতে তো তুমিই ওস্তাদ—শুনলুম মিসেস শেমিজকে নানা রকম মিষ্টি পাকিয়ে খাওয়াচ্ছ !

—ভুল কথা ! সে আমায় আস্ত খেতে পারলে বাঁচে।

—দে'খ—হজম না করে ফেলে—

—গলায় গিয়ে বাঁধব—

উভয়ই খুব হাসে। রবীন্দ্র গম্ভীর হইয়া আবার বলে—আমার কাছে ও বিদ্যায় ফাঁকি দিতে পারবে না কেউ !—আমার যিনি হবেন তার খুব শক্ত পরীক্ষায় পাশ করতে হবে—

—তা আমি ত পাক মোটেই জানি নে—

—ওটা খুব গুণের কথা হ'ল না কিন্তু ! ভারতীয় ললনা—পাক জানে না একথা হয় মিথ্যে, না হয় ছলনা—

—থাক্ ও কথা ! শুনলুম তুমি না কি গাদা গাদা বহি পুস্তক, পত্রিকা এনে সাজিয়ে রেখেছ—

—শুধু সাজিয়ে রাখি নি পড়াশুনোও করি !

—তা হলে এখানে ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম খুলে দিয়েছ বলব —

—দোষই বা কী ? একটা ইণ্ডিয়ান—চিড়িয়াখানা ত' এখানে আছেই—কত রকমের লোক আমরা—

রবীন্দ্র হাসে, মিস গুপ্টা পরের প্রসঙ্গ চিন্তা করে। জিজ্ঞাসা করে—তা'হলে তুমি কি হবে ঠিক করলে ?

—কেন, ব্যারিষ্টার।

—নাঃ সিভিলিয়ান।

—নাঃ ব্যারিষ্টার।

—নাঃ সিভিলিয়ান।

আবার লড়াই চলে। উভয়ই কথা কাটাকাটি মুলতুবী রাখিয়া উঠিয়া পড়ে।

১২

মিসেস সেমিজের সঙ্গে ছোট্ট খাট্ট বিবাদ বিরোধ লাগিয়াই রহিল। কয়েকদিনের মধ্যে আবার এক পশ্লা যুদ্ধই হইয়া গেল। মিসেস সেমিজ তাঁহার মাস্তুতো পিসতুতো বা দেশতুতো কোন আত্মীয়ের নিকট হইতে একটী কুকুর উপহার পাইলেন। গোলমাল বাধিবার হইলে দৈবও মাল মশলা যোগায় ; হঠাৎ কুকুরটির নাম লইয়া তাই মারামারি হইবার উপক্রম ! মিসেস

সেমিজ ডাকেন, কাম্ অন্ রবীন ! রবীন্দ্র মনে করে তাহাকেই ব্যাঙ্গভরে ডাকা হইতেছে। সে দেখে,—সে ত নয় ; কুকুরটিই তাহার নামতুতো ভাই হইয়া পড়িয়াছে ! তাহার ক্রোধের সীমা থাকে না,—তবে রে বুড়ী, রাখ্ মজা দেখাচ্ছি !

কুকুর রবীন্দ্র দুই চোখে দেখিতে পারে না। নোংরা জীব ! কিন্তু কুকুরটা রবীন্দ্রের কামরার আশে পাশে ঘুরিয়া বেড়ায়। তাহার পাক প্রণালীর কল্যানেই বিশেষ করিয়া। সেদিন ফাঁক পাইয়া কামরায় প্রবেশ করিয়া তাহার বহি, পুস্তক ঘাটিয়া, "ভারতবর্ষ" পত্রিকার এক বাণ্ডিলে তাহার পদ ও নখচিত্র অঙ্কিত করিয়া দিল।

—দেখুন,—মিসেস সেমিজ, আপনার কুকুর আমার বই-গুলোতে কী করেছে ?—বলিয়া রবীন্দ্র নালিশ করিল।

—আই অ্যাম সরি,—উঃ আপনার ধর্ম্মগ্রন্থে বুঝি আচড় কেটেছে !

—ইউ নটী বয়, রবীন, তোর হাড় ভেঙ্গে গুড়ো করে দেবো'খণ—বলিয়া মিসেস সেমিজ তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। রবীন্দ্র উত্তর করিল,—ওটা ধর্ম্মগ্রন্থ নয় ; বাংলা মাসিক পত্রিকা—

—হোঃ হোঃ তবে আর বেশী কিই বা হয়েছে ! খবরের কাগজ ত আমরা অনেক সময়ে টয়লেট পেপার হিসেবে ব্যবহার করে থাকি—আর কুকুরটা, দেখুন না, আমার হাঁটুটা চেটে

চেটে কি করেছে ; মুখেও আচড় মারতে কম করেনি—রবীন্দ্র মুখের দিকে আর চাহিল না, বলিল,—হ্যাঃ তা বেশ ! কিন্তু মনে রাখবেন, আমার বহি-পুস্তক আমি শ্রদ্ধা করে থাকি। আপনার কুকুরটাকে বেধে রাখবেন—নইলে—

—নইলে, কী করবেন, শুনি !

—উপযুক্ত ব্যবস্থা হবে।

—তা আমার কুকুর আমার বাড়ীতে বেড়াবেই—আপনার যা খুশী করবেন—চোখ রাঙ্গাবেন না বলছি—ভদ্রলোক নন আপনি ? আমি চললুম—মিসেস সেমিজ হন্ হন্ করিয়া উপরে উঠিয়া গেলেন।

রবীন্দ্র রাগে গর গর করিতে করিতে চেয়ার, টেবীল, দরজাপাটে আঘাত করিল।

সেইদিন বৈকালে মস্ত বড় একটী কুকুর লইয়া খেলা করিতে করিতে রবীন্দ্র ডাকিল—আম, অন্ সেমিজ—শো ইউর টীথ্—

মিসেস সেমিজ বারান্দায় আসিয়া দেখিলেন, রবীন্দ্রও তাহার নামতুতো ভগ্নী অর্থাৎ একটী মস্ত বড় মেয়ে কুকুর আনিয়া ফেলিয়াছে ! তাঁহার রাগের সীমা রহিল না। উহাদের মধ্যেকার বিরোধ যাহাই থাকুক, নূতন রবীন ও সেমিজে লড়াই লাগিলে তাঁহার রবীনই যে দন্তাঘাতে শয্যাশায়ী হইবে তাহাতে কোন সন্দেহ রহিল না।

মিসেস্ সেমিজ টেলিফোন ধরিলেন,—হ্যালো, হ্যালো, জজ মিঃ গুপ্টা বাড়ী আছেন ?

—ইয়েছ্, বলুন, কেন ?

—একটু ফোনে ডেকে দিন না—

—আচ্ছা............

— হ্যালো, গুড্ ইভিনিং ! তারপর ? কি মনে করে ?

—উঃ মিঃ গুপ্টা, আর পারি নে ; ছোকরাটা এবার আমার নাগাল নিয়েছে—কী করি বলুন—বলিয়া মিসেস সেমিজ সকালকার ঘটনার বিবৃতি দিতে লাগিলেন—

—হুঁ, হুঁ,—তারপর ? তারপর ? ওঃকি বললেন ?—আপনার কুকুর ? হ্যা ওর নাম কি বল্লেন ?—রবীন ? উঃ মেরেছে—ছোকরাটাকেও আমরা তাই বলে ডাকি। সে ত রাগ করবেই ! কি ? ওটা আপনার দেওয়া নাম নয় ? নামটা পূর্ব্বেই ছিল ? তা থাক্—অনুগ্রহ করে শীঘ্‌ঘীর বদ্‌লে দিন'—ও ঠাণ্ডা হয়ে যাবে—হ্যা, শীঘঘীর—থ্যাঙ্ক ইউ, গুড নাইট।

পরদিন কুকুর রবীনকে মিসেস সেমিজ ঈগ্‌ল বলিয়া শুধু ডাকিলেনই না ; বারে বারে উচু গলায় ডাকিয়া রবীন্দ্রকে বহুবার শুনাইলেন। রবীন্দ্র এই জয়ে এত খুশী হইল যে সেইদিনই তাহার কেনা কুকুরটাকে অর্দ্ধেক দামে বিক্রী করিয়া আসিল।

১৩

সুবোধ দেখা দিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—

—হ্যারে, জজ গুপ্টার ওখানে গিয়েছিলি— ?

হ্যাঃ—বহুবার !

—মেয়েটার সঙ্গে জানা হয়েছে ?

—হয়েছে।

—কি রকম ?

—বেশ দেখতে—

—শুনতে ?

—তাও বেশ্। তুই কি বলিস ?

—কেন ? রূপসী, ষোড়শী, গায় কী সুন্দর, নাচে কী মনোহর,—তবে—

—তবে কিরে ?

—তবে—বুঝতেই পারবি—উড়ি উড়ি ভাব, বিলিতী স্বভাব, কাছে ভেড়া যায় কিন্তু টিকে থাকা দায়—

—ওঃ তাই ? আমি কুৎসা করবার মত এখনও বড্ড কিছু পাই নি—

সুবোধ এবার কথা ঘুরায়,—তোর রিসার্চ্চটা ? ঐ যে বলছিলি পরাধীন দেশ সমূহ কি কি পন্থা অবলম্বন করিয়া স্বাধীন হয়েছে—তা কতদূর লিখেছিস ?

—শুধু, নোট করা হয়ে গেছে। এখন লিখ্‌ব।—মাসিক পত্রিকায় 'বিলাতে প্রবাস' শীর্ষক প্রবন্ধ লিখছি।—

—বেশ, লিখ্, আমরা পারি নে বলে হিংসে হচ্ছে।

খুব জমে না। সুবোধ উঠে।

১৪

ইহার পরে কয়েকদিনেই রবীন্দ্রের মনে হইল, সে বড্ড সংযত হইয়া পড়িয়াছে। কাহারও সঙ্গে বিশেষ আলাপ জমিয়া উঠে না। আবার যাহারা আলাপ করিয়া বসে তাহাদের যেন কেমন একটা দুমুখো ভাব! মনে যে তাহাকে বিষের মত দেখে, মুখে সেই আবার হাসিয়া ধন্যবাদ দেয়। 'থ্যাঙ্ক ইউ' যেন সবাইর একটা সাধারণ মুখোস্! খাটী মানুষ কী এদেশে এতই দুর্লভ!

হঠাৎ তাহার জীবনেও পরিবর্ত্তন আসিল! খাঁটী মানুষের খোঁজে বিভোর রবীন্দ্র যে শেষে একটী মেয়ে-মানুষের হাতেই ধরা দিবে, এ কেহ কল্পনাও করিতে পারে নাই। মেয়েমানুষের সঙ্গে মেলামেশা জীবনে ততটা করে নাই, তাই তার সলজ্জ আড়ষ্ট ভাবও কাটে নাই। কিন্তু রতি দেবীর সর-সন্ধান অব্যর্থ। যুবক যুবতীর তাই প্রেমোচ্ছ্বাস সময় মত আপনা হইতেই আসিয়া পড়ে।

ব্যাপারটা ঘটিয়া বসিল এই ভাবে।

রবীন্দ্র একদিন রাত্রে শুইবার পূর্ব্বে অনেকক্ষণ চিন্তা

করিল, শুইবার পরেও চিন্তা কমিল না। ঘুমে অচেতন হইবার পূর্ব্ব মূহূর্ত্তে অস্ফূট স্বরে কিন্তু দৃঢ় চিত্তে বলিল—না এমন করে নির্জীব হয়ে রইব না। কখ্খনও না।

পরদিন প্রাতে সে 'সজীব' হইল। কয়েকবার বুকডন্, হাতের কসরৎ, উঠা—বসা করিয়া বলিল, "খাঁটী মানুষ একদিন মিলবেই।"

বৈকালে ব্রিটিশ্ মিউজিয়াম লাইব্রেরীতে না গিয়া সে পার্কে বাহির হইল। এই যে পার্কে কতলোক—বালক বালিকা, কিশোর কিশোরী, যুবক যুবতী এমন কি বৃদ্ধ বৃদ্ধা পর্য্যন্ত সকলেই সজীব; জীবনকে উপভোগ করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে—হাত ধরাধরি করিয়া বেড়াইতেছে—বেঞ্চের উপরে পাশাপাশি বসিয়া মন খুলিয়া আলাপ করিতেছে—সবাই কি শুধু প্রহসনই করিতেছে? নাঃ, জীবনকে উপভোগ করিবার মত তাহাদের ইচ্ছা ও সামর্থ্য আছে।

সেইদিন পার্কে ঘুরিতে ঘুরিতে রবীন আপ্রাণ চেষ্টা করিল কাহারও সহিত মন খুলিয়া আলাপ করা যায় কিনা—সে পুরুষই হউক, আর নেহায়েৎ মেয়েমানুষই হউক—কিছুতেই বিশেষ ক্ষতি নাই।

হাঁটিতে হাঁটিতে সে যুবক যুবতীর মাঝখানে আসিয়া পড়ে, বলে এক্সকিউজ মি—Sorry! যুবক যুবতী বিরক্ত

হয়; আবার হাসিয়া তাহাকে 'এক্স-কিউজ' করিয়া চলিয়া যায়। কি বিপদ? আলাপ কি তবে জমিবেই না!

সন্ধ্যা হয় হয় এমন সময় সে পার্কের এক কোনে একটী বেঞ্চের উপর একটী মেয়ে বসিয়া আছে দেখিতে পাইল। মেয়েটীর চেহারা মলিন, চোখ তখনও যেন ঘুমে ভরা; বার বার হাই তোলে যেন লম্বা ঘুম হইতে উঠিয়া এই মাত্র উঠিয়া আসিয়াছে। শরীরের গঠন যৌবন দীপ্ত; দেখিলেই মনে হয় সে খুব কর্ম্মপটু। সঙ্গে একটী কুকুর।

রবীন তিন চারবার উহাকে প্রদক্ষিণ করিল। মেয়েটী চাহিল না। সে যেন ঘুম ঘোরে চিন্তান্বিতা!

রবীন ভাবিল মেয়েটীর এই নিঃসঙ্গতার নিশ্চয়ই কারণ আছে। বোধ হয় সেও তাহারই মত সঙ্গী খুজিতেছে। হয়ত তার জীবনের পশ্চাতে এমন কিছু লুক্কায়িত আছে যাহা রবীনের সহানুভূতি ভিক্ষা করিতেছে। হয়ত সেও মুখোস্ ছাড়া উন্মুক্ত মন ও খাঁটী দরদীর প্রতীক্ষায় আছে।

রবীনের মেয়েটীকে হঠাৎ ভা—রী ভাল লাগিয়া বসিল।

মেয়েটী কতক্ষণ অসাড়ের মত পড়িয়া থাকিয়া এবার উঠিল। কুকুরটীকে একটু খেলা দিতে গিয়া পাথর ছুড়িয়া ধরিয়া আনিতে নির্দ্দেশ করিল,—সু (sue) ডগী, সু ... ...।

রবীন এবার নির্ব্বিকারে বেঞ্চের অপর কোনে বসিয়া পড়িল। ভরসা, মেয়েটী ফিরিয়া না আসিয়া যাইবে কোথায়?

ফিরিবার নাম কিন্তু সে মোটেই করিল না। পক্ষান্তরে সে কুকুরের খেলায় বেজায় মন দিয়াই ফেলিল। "—সু ... ডগী......সুর" অভিনয় পুনঃ পুনঃ চলিতে লাগিল।

রবীন ব্যথিত হইয়া আশা ছাড়িল। প্রায় শতেক গজ দূরে যাইতেই ফিরিয়া দেখিল মেয়েটী আবার বসিয়া পড়িয়া বিশ্রাম করিতেছে। উঃ...তারই জন্য এতক্ষণ বসে নাই! হিংসা? ঘৃণা? না—চেহারায় ত তেমন দেখায় না!

তাহার ভাল লাগার কারণই ওর চেহারা! স্বচ্ছ, নির্ম্মল, —কুটীলতার লেশমাত্র নাই। রং, পাউডার, সাজসজ্জার আড়ম্বর বিহীনতা—অন্য লোকের গায়ে অযথা ঢলিয়া পড়িবার প্রচেষ্টার বালাই না থাকা—যুবকদলের প্রতি অকৃত্রিম উদাসীনতা—উহাদের ও উহার চারিদিকে ঘুরঘুর করিবার আস্কারা না দেওয়া—সকলই যেন রবীনের ঠীক মনের মতন! যেন—'বাংলার বধু—বুকে তার মধু—নয়নে নীরব ভাষা—!'

রবীন সারা জীবন যাহাকে খুঁজিয়াছে—এ যেন সেই! সে এই আবিষ্কারে একেবারে আত্মহারা হইয়া উঠিল।

হঠাৎ তাহার মাথায় এক নূতন আইডিয়া খেলিয়া গেল। সে যে ভাবেই হউক দৃষ্টি আকর্ষণ করিবেই। জগতে যাঁহারা কৃতকার্য্য হইয়াছেন সকলেই ত উদাসীন জগতের দৃষ্টি জোর করিয়া আকর্ষণ করিয়াছেন। সে পারিবে না?

পদচারণ করিতে করিতে আবার ঐ দিকে ঘুরিয়া আসিতেই রবীন তাহার রুমালখানি পকেটে রাখিবার ছলে ঘাসের উপর ফেলিয়া দিল। কুকুরটী হঠাৎ নেজ নাড়িল;—ধা করিয়া আসিয়া রুমালখানি-মুখে করিয়া লইয়া গিয়া মেয়েটীর পায়ের কাছে রাখিয়া দিল। মেয়েটী তর্জ্জন গর্জ্জন করিল, কুকুরকে মারিতে চাহিল, অবশেষে ক্ষমা চাহিয়া ফিরাইয়া দিবে—বলিয়া রবীনের দিকে চাহিয়া রহিল! রবীন তখন অনেক দূরে গিয়া পড়িয়াছে। দৃষ্টি যখন সে আকর্ষণই করিয়াছে, তখন ব্যস্ত হওয়ার প্রয়োজন নাই। কাজ ত হবেই!

আবার ঘুরিয়া আসিতেই মেয়েটী সলজ্জভাবে পথ আগলাইয়া আসিয়া পাকড়াও করিল—গুড্ ইভিনিং, মিঃ……

রবীনের তখনকার অবস্থা কল্পনা করাও মুস্কিল। আনন্দের আতিশয্যে তাহার নাম পর্য্যন্ত ভুলিয়া যাইবার উপক্রম হইল!

শুধু হেয়ালীর মত তাহার মনে পড়িল তাহার নাম "র" দিয়া আরম্ভ এবং "সেন" দিয়া শেষ হয়! দুই তিনবার ঢোক গিলিয়া হাত দিয়া টাই নাড়চাড়া করিতে করিতে অতি কষ্টে চীৎকার করিল,—সেন!

মেয়েলোকের সঙ্গে মধুর আলাপে সে কখনই অভ্যস্ত ছিল না।

—ও মিঃ সেন, আপনার রুমালখানা পড়ে যাওয়ায় আমার কুকুরটী উঠিয়ে নিয়েছিল—এই নিন্…

রবীন তখন আনন্দে আত্মহারা; ধন্যবাদ দিতে গিয়ে বলিল—কুকুরটার দয়া—মানে আপনার দয়া……ধন্যবাদ, এত কষ্ট করলেন?

মেয়েটি হাসিয়া উত্তর করিল—কুকুরটা? ওঃ—ওটা বড্ড দুষ্ট, এমনি কোরে যা পাবে ধরে আনবে?—আর আমি? —ওঃ মিঃ সেন,—আপনার রুমালের পরিবর্ত্তে যদি ধরুন আপনার মানিব্যাগটাই পড়ে যেত তা হলে বোধ হয় অনেক কিছুই সন্দেহ করতেন,—নয়?

রবীন ভারী মজিয়া গেল, এই ত সুরু! পাল্টা হাসিল—আমার টাকা পয়সাটা কিন্তু অন্যের হাতেই নিরাপদ থাকে বেশী মিস্ … … —

—বাটার ফিল্ড—

—মিস্ বাটার ফিল্ড—

—বটে, বটে … আপনি বড্ড ভালমানুষ মিঃ সেন, কিন্তু দেখুন আমার এখন একটু যেতে হবে—সারা রাত কাজ করতে হয় কি না! —এখন আসি—বিদায়, কাল দেখা হবে—।

—গুড নাইট, মিস্ বাটার ফিল্ড, নিশ্চয় নিশ্চয় আমি রোজ রোজ আস্‌ব গুড না—ই—ট!

দূর হইতে উত্তর আসিল—গুড নাইট মিঃ সেন, গুড না … ই … ট …

ক্ষণিকের জন্য রবীন নিষ্প্রভ হইল। "কাল দেখা হবে" মনে ফিরিতেই আবার তাহার আনন্দ দেখা দিল। লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া বাসায় ফিরিতে ফিরিতে ভাবিল,—মনের মতন মানুষ না পাইলে কি আর আলাপ জমে? মেয়েটী কী—খাঁটী! চেহারায়ই বুঝে ফেলেছি!

সেইদিন সারা রাত্রি রবীন্দ্র রিহারস্যাল করিল, মিস্ বাটার ফিল্ড; মিস বা—টার ফিল্ড; মিস বাটা—রফিল্ড, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

১৫

পরদিন সে ভালরূপে প্রস্তুত হইয়া বাহির হইল। বাস্তবে যাহা করিবে তাহা আগেই রিহারস্যাল করিয়া ঠিক করিয়া লইল। সেই একই স্থানে মিস্ এর সঙ্গে দেখা হওয়ায় রবীনের আনন্দ হইল—মুখের কথা সে ঠিকই রাখিয়াছে। সার্টের আস্তিন টানিয়া, নেক্টাইটী সোজা করিয়া মুষ্টিবদ্ধ অবস্থায় সাহসে ভর করিয়া চিৎকার করিল—গুড-ইভিনিং, মিস বাটারফিল্ড—ভাবিল, সম্ভাষনটী তাহার হইল কেমন!

ঝগড়া করিতে হইলে, তাহার এত অসুবিধা হইত না। কিন্তু এ যে মধুর আলাপন! সে বড্ডই অনভ্যস্ত!

উত্তর হইল—গুড ইভিনিং, মিষ্টার সেন।

—হ্যা—কুকুরটীর শরীর কেমন? মানে আপনি ভাল আছেন ত?

মেয়েটী একটু অপ্রস্তুত বোধ করিয়া রঙ্গচ্ছলে ধন্যবাদ জ্ঞাপক জবাব দিল—হ্যা ভালই ! কুকুরটীকে এখনও ব্যয়াম করাই নি !

—আমি আশ্চর্য্য বোধ করি কত শিক্ষা দিয়ে আপনি কুকুরটীকে এমন সজাগ রাখছেন। কিছু ভুলে গেলেই ও অমনি তুলে নেয়। আমি মনে করি অমন একটা কুকুর আমার সঙ্গী থাকলে কত সুবিধা হত—আমি বড্ড জিনিষ ভুলে যাই কি না—

—ভুলে যান ? তা কুকুর সব সময় বিশ্বস্ত চাকর বলেই আখ্যা পেয়ে আসছে—

রবীন কুকুরের সম্বন্ধে বহু তথ্য সকাল বেলায় এনসাই—ক্লোপেডিয়া ঘাটিয়া মুখস্ত করিয়া আসিয়াছে—সাগ্রহে বলিল, কিন্তু দেখুন, মিস বাটার ফিল্ড, আমি এ কুকুরটার চেহারায় একেবারে মুগ্ধ ! বলতে কি এখন আমরা ওদেরে আর ভৃত্য বলে নাও মনে করতে পারি—

—কারণ ?

—ওই যে ডারউইনের মতবাদে ও ত আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরই আত্মীয়—আপনার এটা কী সুন্দর ! এটি কোন টেরীয়ার ? বুল ? ফক্স ? স্কচ ? আইরীশ ? ওয়েলশ ?

—দেখুন—ওটা কোন টেরীয়ারই নয়। নিছক দিশী সাধারণ কুকুর—তবে যথেষ্ট ট্রেনীং দেওয়া হয়েছে ! তত সচ্ছল

আমার অবস্থা নয়। শিক্ষা দিলে স—ব হয় বলে আমার বিশ্বাস—

রবীন চমকপ্রদ কোন মন্তব্য করিবে চিন্তা করিল ; বলিল—মিস বাটারফিল্ড ! আপনি যদি ট্রেনীং ক্লাশ খুলতেন তাহলে কিন্তু ছাত্রের কোন অভাব হত না, এই ধরুন না—কুকুরটাকে আপনি যে ভাবে——

মেয়েটী অপ্রস্তুত হইল। রবীন ভাবিল সে মাত্রার বাহিরে চলিয়া গিয়াছে! জোর দিতে গিয়া বলিল—আমি ঠাট্টা করছি না মিস বাটারফিল্ড—সত্যি--আই মিন্—

মেয়েটী প্রসঙ্গ ছাড়িয়া বলিল—দেখুন বড্ড ঝড় বৃষ্টি আস্‌ছে—আমাদের শীঘ্‌ঘীর ফিরে যাওয়াই ভাল। নয় কি ?

রবীন এবার হাত জোড় করিয়া নিবেদন করিল—তাইত একটু বিলম্ব করুন—একখানা ট্যাক্সি ডেকে আনছি।

কেন ? আমিত হেটেই যেতে পারব—আপনি যদি কিছু না মনে করেন তবে—

—কিছুই মনে করব না—করতে পারি না—কিন্তু এই যে ঝড় এসে পড়ল, চারদিক অন্ধকার—আপনি যদি কিছু মনে না করেন তবে—

—বেশ তা হলে ডাকুন—

ট্যাক্সিতে রবীন এতটুকু মাত্র জায়গা লইয়া—পাশে বসিল। কুকুরটাও মুখের কাছে পাইয়া তাহাকে চাটিয়া চাটিয়া

ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। উহাকে সংযত করিতে করিতেই সময়টুকু কাটিয়া গেল! মিস হুকুম করিল—এই—যে এই বড় বাড়ীর সামনে থাম।

রবীন দেখিল প্রকাণ্ড বাড়ী। মেয়েটী সিড়ির পাশে দাঁড়াইয়া বিদায় লইল ;—মিঃ সেন—সকাল সকালই একটু সরে পড়ুন—বড্ড ঝড় বৃষ্টি আসছে—তা হলে গুড নাইট !

—গুড্ নাইট—চালাও সামনে। চারিদিকে অন্ধকার ; ইলেকট্রিক বাতিকেও নিষ্প্রভ করিয়া ঝড় বৃষ্টি আসিয়া পড়িল।

সে রাত্রে ঝড় বৃষ্টি বাড়িল। শত দুর্য্যোগেও কিন্তু রবীন্দ্রের মন নাচিয়া উঠিতে লাগিল। হঠাৎ তাহার মনে হইল তাহার আসল নামটাই চাপা পড়িয়া গিয়াছে কিন্তু ভুল ত স্বীকার করা চলে না।

১৬

পরদিন সন্ধ্যায় রবীন সম্ভাষণ করিল—গুড্—ই—ই—ই ভিনিং মিস বাটারফিল্ড !

গুড ইভিনিং। মিঃ-সেন !

হ্যা দেখুন একটা কথা বলি—আপনাকে আমার নামের শেষেরটুকুই দিয়েছি—আমাকে রবীন বলে ডাকতে আপত্তি আছে ? কয়েকজন বিশিষ্ট বন্ধুবান্ধবীকে মাত্র আমার নামের প্রথমটুকু বলে ডাকতে দেই—আমার দেশের রীতিও এখানকার

মতই—তবে আপনি যদি আমায় ও বলে ডাকেন তাহলে বাধিত হতুম—

সে উত্তর করিল—বেশ নিশ্চয়ই—আমি—পরম সুখী হব—আর মনেও থাকবে ভাল—আমার কাকিমা কাকাকেও ওই বলে ডাকেন।

ডাকেন ?

কুকুরটি বরাবরই দুষ্ট। রবীনের হাঁটুতে আঁচড় মারিয়া মারিয়া উহাকে বিব্রত করিয়া তুলিতেছিল। সে কিন্তু অসীম ধৈর্য্য দেখাইয়াই যাইতেছিল—এমন নারীর সকাশে সে অধীর হইবে ?

মেয়েটির চোখ পড়িতেই লাফাইয়া উঠিল—হিয়া—পিটার—আর আপনি আমাকে বলছেন না এতক্ষণ মিঃ সেন ! আই মিন, মিঃ রবীন ?

রবীন উত্তর করিল—ও কিছু নয়, ওকে আগে ব্যায়াম করান হয়নি কিনা ? পিটার বড্ড ভাল—দিন আপনি ওকে ছেড়ে—

কুকুর লইয়া এই সোহাগের বিতণ্ডা চলিতেছিল ইতিমধ্যে রবীনের বন্ধু সুবোধ কোথা হইতে যেন ঐ দিকে আসিতেছে দেখিয়া তাহার আর আহ্লাদের সীমা রহিল না। চোখ টিপিয়া হাসিমুখে ইসারা করিল—সরে পড়, বিরক্ত কোরতে আর এখন এস না—বড্ড ডেলিকেট ষ্টেজ !

আলাপ আলোচনা ঘনিষ্ঠভাবেই চলিতে লাগিল। রবীনের আড়ষ্টতা অনেকটা কাটিয়া গিয়াছে। সময় সময় সে একটু মাত্রা ছাড়িয়াই চলিতে লাগিল।

রবীনের আগ্রহাতিশয্য দেখিয়া মিস বাটারফিল্ড এবার আঁতকিয়া উঠিল। ব্যাপার ত বিশেষ ভাল নয়? শেষে কোথায় গিয়া গড়াইবে কে জানে? পরক্ষণেই তাহার সাহস ফিরিয়া আসিল। বহুদিন পর্য্যন্ত তাহাদের যুবকদের আদর অভ্যর্থনা সহ্য করিতে হয়! এ একটু বিদেশী মার্কা—এই যা।—দশজনে করে যাহা, রবীনও করিবে তাহা—

রবীনও ভাবিতেছিল শেষ কি কথা দিয়া তাহাকে তুষ্ট করিবে। মেয়েটী শীঘ্রই বিদায় লইবে দেখিয়া সে ভাবের আবেশে নিবেদন করিল—দেখুন মিস বাটারফিল্ড—আমি প্রায়ই চিন্তা করি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলনের অন্তরায় শুধু লোকদের প্রাণ খুলে আলাপ করবার অভাব! কিছুতেই তারা মন খুলে আলাপ করবে না যদিও সকলেই একই পৃথিবীর লোক। আমার কিন্তু মনে হয়—আপনার প্রকৃতি ঠিক উল্টো—দেশ কাল পাত্র উপেক্ষা করার মত মনের বল আপনার আছে—অনুগ্রহ করে যদি কাল আমার সঙ্গে নৌকাভ্রমণে গিয়ে একটু চা'পান করেন তাহলে চিরবাধিত হব।

মেয়েটী কিছুক্ষণ ভাবিয়া সাহসে ভর করিয়া উত্তর দিল—আচ্ছা বেশ—তাহলে দিনের বেলায় যোগাড় করবেন। রাত্রিতে আমার কাজ থাকে।

সেই সন্ধ্যায় রবীন ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিল যে, যদি প্রেম অভিযানে কৃতকার্য্য লোকদের নিকট হইতে প্রেম নিবেদনের সর্ব্বাপেক্ষা অমোঘ উপায় বা সহায়ক পন্থা কোনটী জিজ্ঞাসা করিয়া টেণ্ডার চাওয়া যাইত, তাহা হইলে শতকরা নিরানব্বই জনই নৌকাভ্রমণই যে সবচেয়ে উৎকৃষ্ট—এই বলিয়া রায় দিত। সে ঠিক সেই পন্থাই বাহির করিয়া ফেলিয়াছে! ধন্য তাহার বুদ্ধি।

১৭

জজ গুপ্টের বাড়ীর দিকে রবীন্দ্র কয়েকদিন আর মুখ করে নাই। জজ সাহেব বলিলেন,—শুনেছ হে! ছেলেটা বড্ড পড়া শুনোয় মন দিয়েছে—কি বল তুমি?

পত্নী শ্লেষের সুরে কহিলেন,—তোমার ওই যা; পড়া-শুনোর জন্য বুঝি লোকে আর চোখে দেখে না! আমাদেরে ভাল লাগলে সে সকাল বিকেল এখানে ঘুরঘুর করত! কী জানি, মেয়েটা কী বলে ওকে ভাগিয়েছে! পোড়া কপাল—

হঠাৎ "কী বল্‌লে, মা,—আমার কী দায় পড়েছে ওদেরে ভাগাবার,"—বলিয়া পাশের ঘর হইতে মঞ্জু গুপ্টা ঝড়ের মত আসিয়া মায়ের চোখে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া দাঁড়াইল।

বলিল,—ওর সাহেবী ভাল লাগে না, তোমরা জোর করে ওকে ফিরিঙ্গী করে তুলবে—ত আসবে কেন ? আমি বলে দিয়েছি এখানে ঘন ঘন না আসবার—

—ঐ শুনেছ ? গুণধরী মেয়ে তোমার। —হ্যা—রূপবতী, বলি,—তুই আসতে না করে দিয়েছিস ত আসবে কেন বল্ ত ? আমাদের কী দায় পড়েছে ওকে সং সাজাবার ! ওর বাবাই ত চিঠিতে চিঠিতে "আই.সি.এস." "আই.সি.এস." করে অস্থির করে তুলছেন—বল না তুমি ? হা করে রইলে যে ? —জজ সাহেব হা বন্ধ করিলেন, বলিলেন,—এ'সো মা আমার কাছে। যাক্ পরের জন্যে আমাদের কলহের কী দায় হল ?

পত্নী এবার হা করিলেন,—তবে, তোমার মেয়েকে শাঁখ, শাড়ী, সিন্দূর পরিয়ে বাংলার পল্লীবধূটী সাজিয়ে দিও—কিন্তু রাঁধবেন কি করে ? কাল ত ষ্টোভটা ধরাতে হাত পুড়ে ফেলেছেন—আলুর দম, ছানাভাঁজা—

জজ সাহেব আর পত্নীকে অগ্রসর হইতে দিলেন না।—তোমরা দু'জনে দুদিকে—যাও, বলছি—বলিয়া নিজেই শেষে সরিয়া পড়িলেন।

মেয়ে ঝড়ের বেগে চলিয়া গেলে জজপত্নী কতকক্ষণ গম্ভীর হইয়া বসিলেন। তারপর পাউডার পাফ দিয়া মুখমণ্ডল সুবিন্যস্ত করিতে লাগিলেন। তিনি রাগে একটু কাঁদিয়াই ফেলিয়াছিলেন !

মঞ্জুর মনে প্রসন্নতা আসিল না। সে সন্ধ্যাবেলায় বাবা মার অনুপস্থিতিতে টেলিফোন ধরিল। অতি বিনীত স্বরে মিসেস সেমিজকে জিজ্ঞাসা করিল—বাঙ্গালী ভদ্রলোকটী ভিতরে? কী করেন আজকাল? অসুখ হয় নি ত? চেহারাটা রোগা রোগা দেখাচ্ছে?—

মিসেস সেমিজের উচ্চ হাসিতে টেলিফোনের রিসিভার ফাটিবার উপক্রম!—হোঃ হোঃ ওর কথা জিজ্ঞেস করা হচ্ছে?—সে ভারী মজা! বাইরে! শুধু আজ নয়—কয়েক সন্ধ্যা যাবৎ বাইরেই ঘোরা ফেরা করছে! কী করেন? ওঃ—সে আর বলতে?—ফুল নিয়ে বাসায় ফিরেন—দুপুর রাত পর্য্যন্ত শীষ দিয়ে দিয়ে গান করেন—আর? ওঃ-তার সং সম্পূর্ণ বদলে গেছে—মাথার কোক্‌ড়া চুল সুবিন্যস্ত হচ্ছে—হিমানীর জায়গায় হেজেলীন—নীম টুথ্‌পেষ্টের জায়গায় কলিণস্—রং বে রং এর টাই, রুমাল, এসেন্স—

মঞ্জু আঁতকিয়া উঠিল। বলিল,—বেশ, ভাল, আর জেনে কাজ নেই—মোটের উপর ভালই আছেন—বাবা জানতে চাইছেন কিনা? —ধন্যবাদ—

—ধন্যবাদ—আর একটি কথা মিস্ গুপ্টা—আপনার বাবাকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাবেন—বুঝলেন! জানাবেন কিন্তু! আপনাদের সংস্পর্শে না এলে কী—

—আচ্ছা, বেশ্, জানাব—জানাব—

—আর আমার মনে হয়—ও শীষঘীরই সুমার্জ্জিত ইঙ্গবঙ্গ সমাজের একজন সম্ভ্রান্ত সভ্য——উঃ যেমন জংলীটা এসেছিল !

—আচ্ছা, থ্যাঙ্ক হউ, বেশ, বেশ, জানাব, জানাব জানাব, বলছি—বলিয়া মঞ্জু টেলিফোন বন্ধই করিয়া দিল !

ভাবিল,—তবে রে বেটী—তোর ই-ঙ্গ-বঙ্গ সমাজ—চুলোয় যাক্—উঃ সে ভুল বুঝেছে ? আমি কি চাই এই ! পিতামাতার উপর ক্রোধে তাহার মুখ ছাই হইয়া গেল।

১৮

রবীন মেয়েটীর আদর অভ্যর্থনার জন্য বিপুল আয়োজন করিল। সাধ্য সাধনা যতদূর তাহার দ্বারা সম্ভব হইল তাহাতে ত্রুটী করিল না······

ঘাটে নৌকা লাগিলেই মিস বাটারফিল্ড ব্যস্ত হইয়া ধন্যবাদ দিয়া বিদায় লইল। তাহার ঢের কাজ ছিল।

রবীনের মনে পড়িল, সেই সন্ধ্যায় গ্রেট ইষ্টার্ণ হলে ভারতীয় ছাত্রদের একটা বিরাট সভা হওয়ার কথা। রবীন তখনও আনন্দে আত্মহারা !

অতিশয় ব্যস্ততার সহিত সে একটি ট্যাক্সিতে উঠিতে উঠিতে জিজ্ঞাসা করিল—সীট পরিষ্কার ?

—এই মাত্র একটা কাল ভারতীয় বাবুকে পৌঁছিয়েই সীটটা ঝেড়ে ফেললুম, স্যার—

রবীন দেখিতে তত কাল নয়। বিবাদ করিবার প্রবৃত্তি তখন তাহার ছিল না। ট্যাক্সি সামনে চলিল।

—হেই, কোনদিকে যাচ্ছ ?

—কেন স্যার ? থানার দিকে।

—বাঃ মজার লোক ত দেখছি ; থানার দিকে কেন ?

—স্যার আপনি ত কিছু বলেন নি। আপনার ব্যস্ততা দেখে মনে করলুম আপনি বোধ হয় গোয়েন্দা পুলিশের লোক ; তাড়াতাড়ি থানায় কোন খবর দিতে যাচ্ছেন।

রবীন ভারী রাগ করিল। বলিল, গ্রেট ইষ্টার্ণ হলের দিকে চালাও—সভায় যেতে হবে।

ড্রাইভার হুকুম পালন করিল।

রবীনের আসিতে একটু দেরী হইয়া গিয়াছে। সবেমাত্র তখন ননকোঅপারেশন আন্দোলন সমর্থন করিয়া প্রস্তাব পাশ হইয়া গিয়াছে। যে সকল ছাত্র সেখানে সমবেত হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে অনেকেই জালিওয়ানওয়ালাবাগ ব্যাপারটার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিয়াছে।

রবীন ধা করিয়া সভাপতির টেবিলের সামনে গিয়া হস্তপদ সঞ্চালন ও মুখব্যাদন করিয়া বক্তৃতা ঝাড়িল—মাননীয় সভাপতি মহাশয় ও উপস্থিত বন্ধুমণ্ডলী—

—থাম রবীন—সিট্ ডাউন ; ইউ আর টু লেইট—চারিদিকে কলরব শুরু হইল।

রবীন আরও উচ্চ স্বরে নিবেদন করিল—এ সভায় বলবার আমার অধিকার রয়েছে—আমি বলব—অসহযোগ আন্দোলন বিশেষভাবে করার দরকার আছে বলে আমার আদৌ বিশ্বাস হয় না, কারণ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্তের মধ্যে অসহযোগ, ব্যবধান ত বরাবরই রয়েছে। চাই আরও ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধ। মনের মিল থাকলে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় কুরুক্ষেত্র,—পাণীপথ,—পলাসী বা জালিওয়ানওয়ালাবাগ……

সভাপতি ধমক দিলেন—অর্ডার, অর্ডার! আপনাকে বলবার কোন অনুমতি দেওয়া হয় নি, মশায় থামুন বলছি—

রবীন তখন ঘর্ম্মাক্ত,—প্রচণ্ড বাধা পাইয়া মুখে থামিলেও মিনিট পাঁচেক পর্য্যন্ত আকার ইঙ্গিতে ও অঙ্গভঙ্গীতে দেখাইল যে তাহার একটা সাধনায় সে অকস্মাৎ ব্যাহত হইল। তাহা সত্বেও গান্ধিকী জয় রবে সভা ভঙ্গ হইল।

১৯

রবীন আহত হইয়া ফিরিতেছিল হঠাৎ তাহার বন্ধু সুবোধের সঙ্গে দেখা হওয়ায় তাহার পূর্ব্বের দিনকার স্মৃতি জাগিয়া উঠিল। সুবোধ নিজের চোখেই দেখিয়াছে সে পূর্ব্বদিন সন্ধ্যায় মিস বাটারফিল্ডের সহিত কী মধুর আলাপনে ব্যস্ত ছিল!

—তুই দেখেছিস, ভাই কী ঘনিষ্ঠ আমাদের সম্বন্ধ; আর আজ এই অসহযোগী প্রস্তাব; চল্ ভাই, তোকে বলছি—

আজ সন্ধ্যায় নৌকা ভ্রমনে তাঁকে নিয়ে গিয়ে কত মধুর আলাপ আলোচনা করেছি—

সুবোধ এড়াইতে চাহিয়াও পারিল না। রবীন তাহাকে ভালমতেই পাকড়াও করিল।

গাড়ীতে আলাপ বিশেষ জমিল না, কারণ ড্রাইভার নিকটে।—রবীনের কিন্তু রাগ পড়িল, কারণ শীঘ্রই সে অন্ততঃ সুবোধকে বলিয়া বলিয়া প্রাণ জুড়াইবে—সে কতদুর অগ্রসর হইয়া পড়িয়াছে। মনের মতনটি সে এবার পাইয়া বসিয়াছে!

কামরায় ফিরিয়াই বলিল—বসে পড়, ভাই, তুই নিজের চোখে দেখছিস, ব্যাপারটা বুঝবি ভাল—

সুবোধ বলিল—আমার কিন্তু সন্দেহ হচ্ছিল যেন তুই ওর কুকুরটা নিয়ে ঝগড়া করছিলি—নয়?—

রবীন হাসিয়া উঠিয়া সুবোধকে চমকাইয়া দিল—হো—হো ঝগড়া ত করেছিলুম ওই বুড়ী বাড়ীউলীর সঙ্গে। এটী যে খাঁটী সোনা! কিন্তু আর ভাই এক সেকেণ্ড, টাইটা খুলে নিচ্ছি—উঃ কী বিড়ম্বনা; গলায় দড়ি দিয়ে আট্‌কে আছি বলেই মনে হয়! লেটারবক্সটাও একটু দেখে নিই—

কিছুক্ষণেই আবার চেঁচাইয়া উঠিল—বেশ্, বেশ্, এইত চাই, ভ্যাখ ফিরেই সে পত্র লিখেছে—মেয়েদের হাতের লেখা দেখলেই বোঝা যায়—ভাবছি কত কষ্ট করে আমার, ঠিকানা

যোগাড় করেছে ও—তোমরা চাও অসহযোগ কোরতে আর এদেশের মেয়েরা মনের মতন মানুষ পেলে প্রেমপত্র পাঠায়! জানিস, ভাই সুবোধ আমাদের দেশের ছেলেরা প্রেম করতে জান্‌লে। — রাখ্ পড়ে নিচ্ছি—

টাইটা খুলিতে বিশেষ সময় লাগিল না। সুবোধ নির্ব্বিকারচিত্তে একটা সিগার ধরাইয়া ফুঁকিতে ফুঁকিতে মাথা নাড়িয়া সায় দিল—তা হবে বৈ কি? তাহলে চিঠীটা আগে পড়েই নে।

রবীন বলিল—হ্যা তোকেও শুনতে হবে—তবে বিশেষ ঘনিষ্ঠভাবের কথাগুলো বাদ দিয়ে শোনাব—কেমন? এক কাপ চা হবে?

—কিছুই এখন লাগবে না—পড়ো যা তাড়াতাড়ি—বড্ড উৎসুক হয়ে পড়লুম দেখ্‌ছ—

রবীন পড়িয়া শুনাইল—

লণ্ডন ইত্যাদি

"ডিয়ার, মিষ্টার রবীন!

—মাত্র কয়েকটী ছত্র লিখে একটা নিবেদন করতে বাধ্য হলুম। মনে কিছু করবেন না, আমি একটী গরীব নার্স। বড্ড কষ্ট করে খেতে হয়।" হোঃ, হোঃ তাইত শুন্‌ছিস্। কত মহান তার কাজটা!—পরোপকার ব্রত তার!

সুবোধ মাথা নাড়িল। রবীন নিজে নিজে পড়িয়া চলিল—

"আমার পক্ষে প্রতিদান করা অসম্ভব। বহু যুবকের প্রেম নিবেদন আমার সহ্য করতে হয়; তাই ব্যবস্থা করেছি"—ছাখ্ ভাই, বড্ড ডেলিকেট কথা আসছে—আমিই পড়ে নিচ্ছি—"তাদেরে Memo of thanks দিয়ে ঋণ পরিশোধ করতে"—

রবীনের শেষ করিতে সময় লাগিল। সে যেন কী রকম গম্ভীর হইয়া গেল! সুবোধ বিদায় লইল, বলিল,—বেশ ভাই, তাহলে উঠি, আমার কিন্তু হিংসে হচ্ছে—একটা মধুর সম্বন্ধ স্থাপিত হচ্ছে বলতে হবে—এমনি করে প্রাচ্য পাশ্চাত্যের মিলন দৃঢ় হবে—বিন্দু পড়ে পড়েই সাগর হয়—আমি যদি তখন বুঝতুম তাহলে নিশ্চয়ই আজকের সভায় তোর সমর্থন করতুম।

বন্ধুকে আগাইয়া দিতে আসিয়া রবীন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—কিন্তু ভাই সভাটায় অমনতর ব্যবহার আমার পক্ষে অশোভন হয়নি কি? সভাপতির কাছে তাহলে ক্ষমা চাইব?

সুবোধ হাসিয়া উত্তর দিল—আমার ত তাই মনে হয়।

রবীন ভারী মুখে সিঁড়ি বাহিয়া কামরায় ফিরিল।

২০

ডিনারের পরে সেইদিন সন্ধ্যায় জজ সাহেবের বাড়ীর টেলিফোন বাঁজিয়া উঠিল।

মেয়ে মঞ্জু গিয়া ধরিয়াই রিসিভার আবার রাখিয়া দিল। বলিল, সুবোধ বাবু কি যেন বলবেন,—বাবা তুমিই ধর।

জজ সাহেব ধরিলেন,—হ্যা, সুবোধ, তারপর কি মনে করে?

—গুড্ ইভিনিং স্যার—আজকের সভাটায় রবি সেন কী কাণ্ডটাই না করল!—

—খুব বক্তৃতা ঝাড়লে, না?—

—না,—বক্তৃতা করতে সভাপতি দিলেন না—তবুও—অনর্গল বকে যাওয়া—ছিঃ কী প্রহসণ!—

—কী?—স্বদেশী মার্কা?—সেই যে বাঁধা বুলি,—"লাঞ্ছিত! অপমানিত! অত্যাচারিত! উৎপীড়িত—ভারতবাসী"—ইত্যাদি?

—না, না, তাইত বল্‌তে চাইছি—উল্টো সুর—এ—কে—বারে উল্টো!

—অর্থাৎ?

—মিলন, মৈত্রী, সহযোগীতা, ভ্রাতৃভাব,—স্যার, আর বলবেন না,—ক্ষেপে গেছে—একে-বারে ক্ষেপে গেছে—বলে কি না প্রাচ্য-পাশ্চাত্যে ব্যবধান ত চিরদিনই রয়েছে—করতে হবে মিলন—দরকার হলে অত্যাচারকে করতে হবে বরণ—এ হ'লে নাকি কুরুক্ষেত্র,—পানিপথ,—পলাশী,—জালিওয়ানওয়ালাবাগ—কোন—টা—ই হত না—স্যার, আমরা সবাই বড্ড লজ্জা পেলুম ওর কাণ্ড দেখে—

জজ সাহেব হা করিলেন, মেম সাহেব আরও বড় হা করিলেন, মঞ্জু—"হয়েছে ত, সামলাও এখন—ও মস্ত বড় সাহেব হয়ে গেছে—" বলিয়া হণ হণ করিয়া নিজের কামড়ায় ঢুকিল।

রবীন্দ্রের যাহা তাহার চোখে ভাল লাগিয়াছিল তাহাই শেষে মিলাইয়া গেল! এই পরিবর্ত্তনের জন্য দায়ী তবে কে? তার পিতামাতা? সে নিজে?

উঃ সে কেন পূর্ব্বেই ধরা দেয় নাই! সে কেন পূর্ব্বেই স্পষ্ট বলিয়া দেয় নাই, নিজের সত্তা হারাইয়া ফেলিয়া লোক কোন দি—ন বড় হইতে পারে না। সে কেন বলিয়া দেয় নাই, ও-গো—অপরে যাহাই বলুক—তোমার স্বকীয়তাই তোমার ভূষণ—পরকীয়তা নয়!

সে তাড়াতাড়ি গাউন ছাড়িয়া শাড়ী পরিয়া আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া—নিজেকে ভাল করিয়া দেখিয়া লইল! নিজের চামড়ার উপরে স্নো-পাউডারের কত উৎপীড়ন! চুলগুলির উপর হেয়ার ড্রেসিং সেলুনের কত অত্যাচার! নিরর্থক অনুকরণ—প্রিয়তা!

হঠাৎ বাবার ঘরের সামনে আসিয়া বলিল,—বাবা, গাড়ীটে একটু নোব।—

—কেন মা? কোথায় যাবে?

—একটু বাই রে—এক্ষুনি, ঘুরে আস্‌ব—

—দেরী হলে ফোন ক'রো।

—হ্যাঁ, করব! বলিয়া—মেয়ে ত্রস্তপদে সিড়ি বাহিয়া নামিয়া গেল।

জজ-পত্নী বিরক্তিভরে বাহিরে আসিয়া জানালা দিয়া দেখিলেন,—মেয়ে মাতালের মত শো শো করিয়া গাড়ী ছুটাইয়া চলিয়াছে—চলিয়াছেই। কী দস্যি মেয়ে! তবু যদি ভাগ্যে একটা সুপাত্র জুটিত!

২১

মোটরের শব্দ শুনিয়া রবীন আগাইয়া আসিয়া দেখিল, সমস্তটা গাড়ীর বারান্দা আলো করিয়া মিস্ গুপ্টা আসিয়া উপস্থিত।

মঞ্জু ঝড়ের বেগে ছুটিয়া আসিয়াছিল। রবীন্দ্রকে প্রকৃতিস্থ দেখিয়া আশ্বস্ত হইল। রবীন গাড়ীর দরজা খুলিয়া দিলে, তাহাকে "থ্যাঙ্ক ইউ" বলিল, দরজার পর্দ্দা সরাইয়া ঘরে নিতে আবার "থ্যাঙ্ক ইউ" বলিল, বসিতে বলিলে, আবার "থ্যাঙ্ক ইউ" বলিয়া বসিয়া পড়িল।

রবীন দাঁড়াইয়াই মুখ বিকৃত করিয়া বলিল, "ঐ যে বাঁধা—বুলি, "থ্যাঙ্ক ইউ" "থ্যাঙ্ক ইউ" শুনে শুনে আর ভাল লাগছে না, মঞ্জু,—মুখের বুলির চেয়ে অন্তরের কিছু কি কারুর কাছে আমি পাব না?

—কে বলেছে পাবে না; তোমার ত গ্রহণ করবার আগ্রহই

বড় একটা দেখা যায় না—আজকের সভার কথা শুনে এলুম—তোমায় কিছু বলবার আছে—

—তা বেশ, বল না—

—তোমার বহি, পুস্তক, মাসিক পত্রগুলো পুড়িয়ে ফেলো নি ত?—আমার জন্য তোমার এত পরিবর্ত্তন?—আমাদের মুখোসটা পেরিয়ে মনটা তুমি দেখলেই না—দেশের জন্য মায়া মমতা আমাদের কোন কালে ছিলই না?—

—তোমার জন্যি? সে হবে—

রবীন পকেটে হইতে মিস বাটারফিল্ডের চিঠিখানা বাহির করিয়া আবার সযত্নে রাখিয়া দিল। ওটা হাতছাড়া হইলে কেহ দেখিয়া ফেলিবে এই ভয়ে!

তুমি ওটা কি লুকোচ্ছো? তোমার ঐ বক্তৃতার খসড়া?

চিঠি!

ওঃ প্রেমপত্র বোধ হয়।

ঠিক, তা নয়; ওতে দেনা পাওনার কথা আছে।

বেশ, তা ওই স্বদেশের পাওনা কি তুমি অস্বীকার করবে মনে করেছ?

ছিঃ! কে বললে? তবে তোমরা ত তাই চাও বলে মনে হয়—

তোমার দিব্যদৃষ্টি খুব তীক্ষ্ণ নয়—এদেশে থাকি বলে সাহেবিয়ানা করলেও অন্তরে আমাদের স্বদেশ প্রেম রয়েছে—তোমারই ওটা একচেটে ছিল মনে ক'রো না।

রবীন্দ্র থতমত খাইল। থামিয়া গিয়া উচ্চহাস্য করিল, বলিল, বড্ড খুসী হলুম, মিস গুপ্টা, হাত মিলাও—শীঘ্‌্গীর!

মঞ্জু হাত মিলাইতে গিয়া আবার টানিয়া লইল, বলিল, আমার হাতে জখম রয়েছে—

কেন? কী করে? চোট লেগেছে? কেটেছে? ফেটেছে?

নাঃ একটু পুড়ে গিয়েছে—

সে কী করে? তোমার ত আগুণের সঙ্গে কোন সম্পর্কই নেই বলেছিলে!

মঞ্জু লজ্জিত হইল। কিছু না বলিয়া চুপ করিয়া গেল।

রবীন্দ্রের পীড়াপীড়িতে সহানুভূতি লক্ষ্য করিয়া আবার তার মুখ উজ্জ্বল ও মন প্রফুল্ল হইয়া উঠিল, বলিল—

ছিল না তবে হালে হয়েছে—

অর্থাৎ?—

পরীক্ষা দেবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলাম। ষ্টোভে হাত একটু জ্বলে গিয়েছে।

ওঃ তা হলে ত আমার কথায় তোমার পরিবর্ত্তন হয়েছে!

হুঃ তোমার আর পরিবর্ত্তন হয়নি?

রবীন্দ্র লজ্জিত হইল। বুক পকেটের মেমোটী সজোরে চাপিয়া ধরিয়া বলিল, কে দিচ্ছে তোমায় শিক্ষা?

কেন, শুনবে ? ঐ যে—Fifty different ways of cooking and serving a chicken by Margery Brand, All about Indian chutneys, Pickles and Preserves with Hindusthani Vocabulary, Butter-making, Dainty Confections, Camp Cookery, Everyday Menus for India, Indian Cookery Book...

রেফারেন্স লিষ্ট শুনিয়া রবীন্দ্রের তাক লাগিয়া গেল—মঞ্জু বলিতে লাগিল,—Sweets and Ices and How to Make Them, Simple Menus and Recipes for Camp, Home and Nursery—গৃহশিক্ষা, আধুনিক পাক প্রণালী, আমিষ ও নিরামিষ আহার, মিষ্টান্ন পাক, রন্ধন শিক্ষা—তা পরীক্ষেটা কবে নিবে ?

রবীন্দ্র হা করিয়া বলিল—সত্য বলছ ? না ঠাট্টা করছ ?

বাঃ রে ! থ্যাকার স্পীংক আর গুরুদাসকে লিখে দেখনা—

রবীন্দ্র বলিল, তা তুমি ফুল্ মার্কস্ পেয়ে গেলে ; তোমার বাবা মার মত থাকে ত ...... তা তুমি কপালে সিন্দুর দিতে রাজী হবে ত ?

মঞ্জু লজ্জিত বদনে বলিল, তোমার মত থাকে ত কোন করে জানতে পারি।...সিন্দুর, শাড়ী, সাত পাঁক ঘোরা, সে যা তোমার ইচ্ছে।

উভয়ে হাত ধরাধরি করিয়া উপরে উঠিল, মঞ্জু বলিল,—গুড্ ইভিনিং মিসেস্ সেমিজ ; ভাল ত ?

—গুড্ ইভিনিং মিস্ গুপ্টা ; আসুন, আসুন, তারপর কি মনে করে ?

—বিবাদ ভঞ্জন !

—ওঃ ওর সঙ্গে ঐ কুকুর নিয়ে গোলমালের পর আর কোন বিরোধ ঘটে নিত !—তা আসুন, মিঃ সেন, গুড্ ইভিনিং !

—গুড্ ইভিনিং—

—আমরা বিয়ে করব মনস্থ করেছি ! তা আমাদের হয়ে আপনি টেলিফোনে ওঁদেরে একটু জিজ্ঞেস করুন না ?

—ওঃ হাউ হ্যাপা ! গড্ ব্লেস্ ইউ টু ।—

মিসেস সেমিজ টেলিফোন ধরিলেন,—ওদিক হইতে আনন্দ-ধ্বনিতে টেলিফোন কাঁপিয়া উঠিল ।—ওঃ তারা দু'জন সুখী হউক ! আমাদের উভয়ের আশীর্ব্বাদ ! আর আপনাকে অশেষ থ্যাঙ্কস্ !

'থ্যাঙ্কস্' কথাটী কাড়িয়া লইয়া রবীন মন্তব্য করিল,—এরা সবাই কেবল মেমো-অফ থ্যাঙ্কস্ দেয়—তুমিই শুধু মেমো অফ লাভ্ দিলে, মঞ্জু !

* * * *

কথা দিয়া ও লইয়া মঞ্জু বাড়ী ফিরিলে, রবীন মিস্ বাটার ফিল্ডের চিঠিখানা আবার খুলিয়া পড়িতে লাগিল ।

মেমো অফ থ্যাঙ্কস্

লণ্ডন ইত্যাদি

"ডিয়ার মিঃ রবীন!

—মাত্র কয়েকটী ছত্র লিখে একটা নিবেদন করতে বাধ্য হলুম। মনে কিছু করবেন না, আমি একটী গরীব নার্স। বড্ড কষ্ট করে খেতে হয়। আমার পক্ষে প্রতিদান করা অসম্ভব। বহু যুবকের প্রেম নিবেদন আমার সহ্য করতে হয়; তাই ব্যবস্থা করেছি তাদেরে মেমো অফ থ্যাঙ্কস (Memo of Thanks) দিয়ে ঋণ পরিশোধ করতে।

"আমি মনে করেছিলুম আপনার সাধ্য সাধনা শেষ হলেই মেমোটি পাঠাব কিন্তু আজ বিকাল বেলা আপনি যে ভাবে হিসাব চুকাবার পীড়াপীড়ি করছিলেন তাতে করে এই সঙ্গেই হিসেব পাঠাতে বাধ্য হলুম। আশা করি মনঃক্ষুন্ন হবেন না।"

পাতা উল্টাইয়া সঙ্গের মেমোটীও আর একবার পড়িল।—

Memo of Thanks

To,

Mr. Rabin Sen, Now of London,

16, Nurses' Quarter. London 1921

এ পর্য্যন্ত আপনার মিষ্টি কথা বাবদ······ধন্যবাদ

এক সন্ধ্যায় ট্যাক্সিতে বাড়ী পৌছান বাবদ······বহু ধন্যবাদ

অদ্য বিকালে নৌকা ভ্রমণ বাবদ······শতশত ধন্যবাদ

নদীবক্ষে আপনার সুমধুর গান, আনন্দ সম্ভাষণ ইত্যাদি বাবদ······শত সহস্র ধন্যবাদ

Cr. বহু আলাপ, আদর সম্ভাষণ, Dr. বহু শত সহস্র ধন্যবাদ।

ইত্যাদি, ইত্যাদি। E & O. E.

(ভুল চুক বাদ)

Miss Butterfield.

তারপর চিঠি ও মেমোটী টুকরা টুকরা করিয়া ছিড়িয়া জ্বালাইয়া ফেলিল!

গ্রন্থখানি ৫৩২ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ এবং বহু চিত্র সম্বলিত। যুবক যুবতী এবং বিবাহিত নরনারী যাহা কিছু জানিতে চায় তাহার সমস্তই ইহাতে পাইবেন। ইহাতে পাওয়া যাইবে না যৌন ব্যাপারে এমন বিষয়ই নাই। মূল্য ৪॥০।

সচিত্র জন্ম-নিয়ন্ত্রণ—মত ও পথ

এইমাত্র বাহির হইল। আধুনিকতম নানারূপ বৈজ্ঞানিক তথ্য-সম্বলিত। বার্থ-কণ্টোল বিষয়ে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য পুস্তক। মূল্য—১॥০।

অনাকাঙ্খিত পুত্র কন্যা লাভ করা ঠেকাইতে না পারিয়া অনেকে মনে করেন, জন্ম-নিয়ন্ত্রণই ভূয়ো কথা। এই বহি পড়িয়া ইচ্ছামত সন্তান লাভ, আবার ইচ্ছা না থাকিলে জন্ম-নিরোধ করিতে পারিবেন। খেলো বহি পুস্তক পড়িয়া অনুশোচনা বাড়াইবেন না। নানা চিত্রে বৈজ্ঞানিক ও নির্ভর যোগ্য মত ও পথ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

কবির প্রেম ও অন্যান্য গল্প

প্রবাসী, বিচিত্রা, দীপালি ইত্যাদিতে প্রকাশিত কয়েকটী মনোরম উচ্চাঙ্গের গল্প। মূল্য—১৷৵০।

অচল সিকি, হোমিওপ্যাথী, ডেপুটী সাহেবের সুমতি, কবির প্রেম, লাভ-ষ্ট্রোক, ইত্যাদি কয়েকটী মনোরম শিক্ষাপ্রদ হাস্য ও করুণ রস-সম্বলিত অতি উপাদেয় ছোট ও বড় গল্প। পড়িতে বসিলে শেষ না করিয়া থাকিতে পারিবেন না।

তরীকৎ বা খোদা-প্রাপ্তি-পথ

ছুফীবাদ সম্বন্ধীয় ধর্ম্মমূলক অমূল্য পুস্তক। ১৲

তাছাওফের সমস্ত-তথ্য প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

Crime and Criminal Justice.

সার হরি সিং গৌর কর্তৃক ভূমিকা সম্বলিত।

অপরাধতত্ত্ব, আইনতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক গবেষণামূলক বিরাট ইংরেজী পুস্তক। পৃথিবীর সর্বত্র সমাদর লাভ করিয়াছে। ৯১৫ পৃষ্ঠা—৫॥০।

Most warmly received in India and Outside

—The author has, by this publication, done an immense service not only to India but to the whole civilization. We recommend the book to every Police Officer and Social Reformer.—**The Criminal Law Journal of India, Lahore.**

—The book deserves to be read by scholars and students who study the problems of Criminology in India and elsewhere.—**The All-India Reporter, Nagpur.**

—The book is bound to prove of immense interest to all those who are interested in the subjects of crime and the treatment of criminals.—**The Bombay Law Journal.**

—We recommend it to all police officers, magistrates and others interested in crime and criminal law.
—**The Calcutta Weekly Notes.**

—The whole book is teeming with informations and discussions of so varied a character that it will be interesting to almost all classes of people. It is alike useful to the Lawyer, the Legislator, the Police Officer, the Social Reformer as also to the students of law and sociology.......
—**The Calcutta Law Journal.**

—No book has been issued from the Indian press which is so comprehensive in its scope, so accurate and sound, and withal so compact and practical.—**The Hindustan Review —Patna.**